অধ্যায় - ২০

শ্রী কাকাসাহেবের ঝি করে শ্রী দাসগণুর সমস্যার বিলক্ষণ সমাধান, অদ্বিতীয় শিক্ষা পদ্ধতি, ঈশোপনিষদের শিক্ষা।

শ্রী কাকাসাহেবের ঝিয়ের দ্বারা শ্রী দাসগণুর সমস্যার কিভাবে নিষ্পত্তি হয়, তারই বর্ণনা হেমাডপন্ত এই অধ্যায়ে দিয়েছেন।

প্রারম্ভ ঃ-

শ্রী সাই (ভগবান) মূলতঃ নিরাকার। কিন্তু ভক্তদের প্রেম পরবশ হয়েই, সাকার রূপে আবির্ভূত হন। মায়ারূপী অভিনেত্রীর সাহায্যে এই বিশ্বের বৃহৎ নাট্যশালায়, তিনি এক মহান অভিনেতার ন্যায় অভিনয় করেন। আসুন, শ্রী সাইবাবার ধ্যান এবং নামস্মরণ করি ও তারপর শিরডী গিয়ে মন দিয়ে, মধ্যাহ্ন আরতির পরের কার্যক্রম দেখি। আরতি শেষ হওয়ার পর, শ্রী সাইবাবা মস্‌জিদের বাইরে এসে এক কোণে দাঁড়িয়ে, অতি করুণা ও প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি মেলে ভক্তদের উদী বিতরণ করছেন। ভক্তরাও তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে, তাঁর দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে, চরণ ছোঁয়ার ও উদী প্রাপ্তির আনন্দ উপভোগ করছে। বাবা দু'হাত দিয়ে ভক্তদের উদী দিতেন এবং নিজের হাতে ওদের মাথায় টিপ লাগাতেন। বাবার হৃদয়ে ভক্তদের জন্য অসীম প্রেম ছিল। তিনি ভক্তদের ভালবেসে বলতেন- "ও ভাউ! এবার যাও, খাবার খাও! আন্না! তুমিও বাড়ী যাও। বাপু! তুইও যা, গিয়ে ভাত খা!" এই ভাবে উনি প্রত্যেক ভক্তের সাথে কথা বলতেন এবং তাদের বাড়ী ফিরে যেতে বলতেন। আহা! কি সুন্দর ছিল সেই দিনগুলি। সেই

যে একবার অস্ত হলো, আর ফিরে পাওয়া গেল না। যদি তুমি কল্পনা করো সেই দিনগুলির কথা, তাহলে এখনো আনন্দ অনুভব করতে পারবে। এবার আমরা শ্রী সাইয়ের আনন্দময়ী মূর্তির ধ্যান করে, নম্র হয়ে, প্রেম ও শ্রদ্ধাপূর্বক তাঁর চরণ বন্দনা করে, এই অধ্যায়ের কাহিনীটি আরম্ভ করছি।

ঈশোপনিষদ ঃ-

এক সময় শ্রী দাসগণু ঈশোপনিষদের উপর একটি টীকা ('ঈশাবাস্য' - ভাবার্থবোধিনী) লেখা আরম্ভ করেন। আগে এই উপনিষদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। বৈদিক সংহিতার মন্ত্রের সমাবেশ থাকার দরুণ, এটিকে 'মন্ত্রোপনিষদ'- ও বলা হয় এবং এতে যজুর্বেদের শেষ অধ্যায়ের অংশ সম্মিলিত থাকার দরুণ এটি 'রাজসনেয়ী (যজুঃ) সংহিতোপনিষদ' নামেও প্রসিদ্ধ। বৈদিক সংহিতার সমাবেশ থাকার জন্যই এটিকে অন্য উপনিষদের চেয়ে উচ্চতর মানা হয়। শুধু তাই নয়, অন্য উপনিষদগুলি কেবল ঈশোপনিষদে বর্ণিত গূঢ় তত্ত্বগুলির উপরই অবলম্বিত টীকা। পণ্ডিত সাতওয়লেকর দ্বারা রচিত বৃহদারণ্যক উপনিষদ ও ঈশোপনিষদের টীকা প্রচলিত টীকাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানা হয়।

প্রোফেসর আর. ডি. রানাডের মতে ঈশোপনিষদ একটি লঘু উপনিষদ হওয়া সত্ত্বেও, তাতে অনেক বিষয়ের সমাবেশ আছে, যেগুলি এক অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। **১৮**ই শ্লোকে আত্মতত্ত্বের, একটি আদর্শ সন্তের জীবনী- যিনি আকর্ষণ এবং কষ্টের সংসর্গেও অচল থাকেন, কর্মযোগের সিদ্ধান্তগুলির প্রতিবিম্ব - যেগুলির পরে সূত্রীকরণ করা হয় এবং জ্ঞান ও কর্তব্যের পোষক তত্ত্বগুলি বর্ণিত

আছে। সবশেষে এতে নীতিশিক্ষা, চমৎকারিতা ও আত্মসম্বন্ধী গূঢ় তত্ত্বের সংগ্রহ পাওয়া যায়।

এই উপনিষদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের মাধ্যমে এটা তো স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এটির দেশীয় ভাষায় বাস্তবিক অর্থ সহিত অনুবাদ করা কতটা দুষ্কর কাজ। শ্রীদাসগণু 'ওবী' (মারাঠী ছন্দ) ছন্দে অনুবাদ তো করেন, কিন্তু তার সার তত্ত্বটি গ্রহণ না করতে পারার দরুণ ওঁর নিজের কার্য্য উপলব্ধিতে সন্তুষ্টি হচ্ছিল না। এরকম অসন্তুষ্ট মনে উনি অন্য অনেক বিদ্বানদের সঙ্গে সংশয় নিবারণের জন্য পরামর্শ ও যুক্তিতর্ক করেন, কিন্তু সমস্যার সমাধান পান না। শ্রী দাসগণু খুবই বিচলিত হয়ে ওঠেন।

কেবল গুরুই অর্থ বোঝাতে সক্ষম ঃ-

এই উপনিষদটি বেদের মহান বিবরণাত্মক সার। এই অস্ত্রটি ব্যবহারের ফলে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায় এবং মুক্তি প্রাপ্ত হয়। অতএব শ্রীদাসগণু স্থির করেন যে, যিনি আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করেছেন, একমাত্র তিনিই এই উপনিষদের বাস্তবিক অর্থ বুঝিয়ে বলতে পারবেন। তাই উনি শেষে শিরডী পৌঁছে, বাবার দর্শন ও চরণ বন্দনা করে উপনিষদের বিষয় যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন সেটা উল্লেখ করেন এবং তার সমাধানের জন্য প্রার্থনা করেন। শ্রী সাইবাবা আশীর্বাদ দিয়ে বলেন, "চিন্তা কোর না, এতে মুস্কিলের কি আছে? ফেরার পথে ভিলে পার্লে'তে কাকাদীক্ষিতের ঝি তোমার সংশয় দূর করে দেবে।" এই কথা শুনে সেখানে উপস্থিত লোকেরা ভাবে যে, বাবা এমনি ঠাট্টা করছেন এবং নিজেদের মধ্যেই আলোচনা করে- "এও কি সম্ভব যে, একটি অশিক্ষিত ঝি এই সমস্যার সমাধান

করতে সক্ষম হবে?" কিন্তু দাসগণুর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, বাবার কথা কখনো অসত্য হয় না কারণ তাঁর কথা বা উক্তি তো সাক্ষাৎ ব্রহ্মবাক্য।

কাকার চাকরাণী ঃ-

বাবার কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে উনি ভিলে পার্লে (বম্বের উপনগরী) পৌঁছে কাকাসাহেব দীক্ষিতের বাড়ীতে ওঠেন। পরের দিন দাসগণু ভোরের মৃদু নিদ্রার আনন্দ উপভোগ করছিলেন, এমন সময় একটি গরীব মেয়ের মধুর গান শুনতে পান। গানের মূল ভাবটি ছিল - একটি লাল পেড়ে শাড়ী, সেটি কত সুন্দর লাগছে, ওর জরীর আঁচলটি কত সুন্দর, ওর পাড়টি কত সুন্দর ইত্যাদি। দাসগণুর এই গানটি খুবই পছন্দ হয়। বাইরে এসে দেখেন যে নাম্যার (কাকাসাহেব দীক্ষিতের ঝি) বোন ঐ গানটি গাইছিল। মেয়েটি বাসন মাজছিল এবং ওর পরনের শাড়ীটা বেশ ছেঁড়া ছিল। এত দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও, ওর প্রসন্নতা দেখে শ্রী দাসগণুর মনে দয়া জাগে এবং পরের দিনই উনি শ্রী এম. ভি. প্রধানকে ঐ মেয়েটিকে একটি শাড়ী দিতে অনুরোধ করেন। রাও বাহাদুর মেয়েটিকে একটা শাড়ী কিনে দিলেন। ঠিক যেমন কোন ক্ষুধার্ত ব্যক্তি ভাগ্যবশে মধুর খাবার পেয়ে আত্মহারা হয়ে যায়, তেমনি শাড়ীটা পেয়ে মেয়েটিরও আনন্দের সীমা রইল না। পরের দিন নতুন শাড়ীটি পরে নেচে নেচে অন্য মেয়েদের সঙ্গে খেলায় মত্ত ছিল। তারপরের দিন নতুন শাড়ীটি বাক্সে সামলে রেখে আগের মতই ছেঁড়া কাপড় পরে কাজ করতে আসে এবং ওর মুখে আগের মতনই প্রসন্নতার ভাব। তাই দেখে শ্রী দাসগণুর দয়া বিস্ময়ে পরিণত হয়। ওঁর এইরূপ ধারণা ছিল যে, গরীব হওয়ার দরুণই মেয়েটিকে ছেঁড়া কাপড় পরতে হতো। কিন্তু এখন ওর কাছে নতুন শাড়ী থাকতেও সেটা খুব সামলে রেখে দিয়ে ছেঁড়া কাপড়েই গর্ব

ও আনন্দ অনুভব করছিল। ওর মুখে দুঃখ বা নিরাশার কোন চিহ্নমাত্র ছিল না। শ্রী দাসগণু বুঝতে পারলেন যে, দুঃখ বা সুখের অনুভূতি কেবল মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। এই ঘটনাটি গম্ভীর ভাবে বিচার করার পর উনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ভগবান যা কিছু দিয়েছেন, তাতেই সন্তুষ্ট হওয়া উচিত এবং যে ধরণের পরিস্থিতি তাঁর দয়ায় প্রাপ্ত হয়, সেটাই আমাদের জন্য লাভপ্রদ হবে। এই বিশেষ ঘটনাতে বালিকার নির্ধনাবস্থা, ওর ছেঁড়া-পুরনো কাপড়, নতুন শাড়ী দান করার লোক এবং তার স্বীকৃতি দেওয়ার লোক, এই সব ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারেই হয়েছিল। শ্রী দাসগণু উপনিষদ পাঠের প্রত্যক্ষ শিক্ষা পেয়ে যান- যা কিছু আমাদের কাছে আছে, তাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। সারতত্ত্ব এই যে, যা কিছু হয়, সব ঈশ্বরের ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, অতএব তাতে সন্তুষ্ট থাকলেই আমাদের কল্যাণ হয়।

অদ্বিতীয় শিক্ষা পদ্ধতি ঃ-

এই ঘটনাটির মাধ্যমে পাঠকগণ ভালভাবেই বুঝতে পারছেন যে, বাবার শিক্ষাদানের পদ্ধতি অদ্বিতীয় এবং অপূর্ব। বাবা শিরডীর বাইরে কখনো যাননি, তবুও তিনি কাউকে মচ্ছিন্দ্রগঢ়, তো কাউকে কোল্হাপুর বা সোলাপুরে সাধনা করতে পাঠান। তিনি কাউকে দিনে, তো কাউকে রাতে দর্শন দিতেন। কাউকে কাজের মধ্যে আর কাউকে নিদ্রাবস্থায় দর্শন দিয়ে, ওদের ইচ্ছে পূরণ করতেন। ভক্তদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি কোন্-কোন্ যুক্তি ব্যবহার করেন, তা বর্ণনা করা অসম্ভব। এই বিশিষ্ট ঘটনায় তিনি শ্রীদাসগণুকে ভিলে পার্লে পাঠিয়ে সেখানে এক ঝিকে দিয়ে তার সন্দেহ দূর করেন। যাঁরা সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন যে, শ্রী দাসগণুকে বাইরে পাঠাবার কি দরকার ছিল- তিনি কি নিজে বোঝাতে পারতেন না; তাঁদের জন্য আমার উত্তর

এই যে, বাবা ঠিক পথই অবলম্বন করেছিলেন। নতুবা শ্রী দাসগণু কিভাবেই বা একটি অমূল্য শিক্ষা, ঐ গরীব ঝি ও তার শাড়ীর মাধ্যমে প্রাপ্ত করতেন। সমগ্র ঘটনাটি স্বয়ং সাইবাবাই রচনা করেছিলেন।

ঈশোপনিষদের শিক্ষা ঃ-

ঈশোপনিষদ মুখ্য ভাবে নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধীয় উপদেশগুলি আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। আনন্দের কথা এই যে, এই উপনিষদের নীতি নিশ্চিত রূপে আধ্যাত্মিক বিষয়ের উপর আশ্রিত, যেগুলি বিস্তৃত রূপে এতে বর্ণনা করা হয়েছে। উপনিষদের আরম্ভই এখান থেকে হয় যে, সমস্ত বস্তু ঈশ্বরের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। এই আত্ম-বিষয়ক নির্দ্দেশের একটি উপসিদ্ধান্ত আছে। যে নীতি সম্বন্ধীয় উপদেশ তার থেকে গ্রহণ করার যোগ্য সেটা হলো যে, যা কিছু ঈশ্বর কৃপায় প্রাপ্ত হয়, তাতেই আনন্দ পাওয়া উচিত এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখা উচিত যে, ঈশ্বরই সর্বশক্তিমান। তিনি যা দিয়েছেন, সেটাই আমাদের জন্য উপযুক্ত। অন্যের ধনের প্রতি তৃষ্ণার প্রবৃত্তিকে শেষ করা উচিত। সারাংশ এই যে, নিজের কাছে যতটুকু আছে, তাতেই সন্তুষ্ট থাকো, কারণ এটিই ঈশ্বরের ইচ্ছে। চরিত্র সম্বন্ধে দ্বিতীয় উপদেশ এই যে, কর্তব্যকে ঈশ্বর ইচ্ছা জেনে, জীবন কাটানো উচিত- বিশেষতঃ সেই কর্মগুলি, যেগুলি শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। এই বিষয়ে উপনিষদের এই মত যে, আলস্যে আত্মার পতন ঘটে। শেষে এই বলা হয়েছে যে, যার জন্য সমস্ত প্রাণী ও পদার্থ আত্মস্বরূপ হয়ে গেছে, তাঁর মধ্যে মোহ কি ভাবে উৎপন্ন হতে পারে? এই ধরনের ব্যক্তির দুঃখের কোন কারণ থাকে না।

সর্বভূতে আত্মদর্শন না করতে পারার ফলেই, নানা রকমের শোক,

অজ্ঞানতা ও ঘৃণা আমাদের মধ্যে দেখা দেয়। কিন্তু সর্বত্র যাঁর 'অদ্বৈত' দৃষ্টি খুলে গেছে, সাধারণ মানবিক দুর্বলতা থেকে তিনি সঙ্গে-সঙ্গেই মুক্ত হয়ে গেছেন।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

অধ্যায় - ২১

১) শ্রী বি. এইচ. ঠাকুর

২) শ্রী অনন্তরাও পাটন্‌কর ও

৩) পন্ঢরপুরের উকিলের কাহিনী -

এই অধ্যায়ে হেমাডপন্ত শ্রী বিনায়ক হরিশচন্দ্র ঠাকুর, শ্রী অনন্তরাও পাটন্‌কর, পুণে নিবাসী ও পণ্ঢরপুরের এক উকিলের কথা বর্ণনা করেছেন। এই সব কথাগুলি অতি মনোরঞ্জক। পাঠকগণ যদি এগুলির সারাংশ ঠিক মত গ্রহণ করে, নিজেদের আচরণে সেগুলি অনুসরণ করেন তাহলে তাঁরা আধ্যাত্মিক পথে অবশ্যই অগ্রসর হতে পারবেন।

প্রারম্ভ ঃ-

এটা একটা সাধারণ নিয়ম যে, গত জন্মের শুভ কর্মের ফলস্বরূপই, আমরা সাধু সান্নিধ্য ও তাঁদের কৃপা লাভ করতে সক্ষম হই। উদাহরণস্বরূপ, হেমাডপন্ত স্বয়ং নিজের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। উনি অনেক বছর বম্বের উপনগরী বান্দ্রায় স্থানীয় ন্যায়াধীশ ছিলেন। পীর মৌলনা নামে এক মুসলমান সন্ত সেখানে থাকতেন। হেমাডপন্তের পুরোহিত ওঁকে মৌলানা সাহেবের দর্শন করতে বলেন, কিন্তু কোন কারণবশতঃ উনি দেখা করতে যেতে পারেননি। অনেক বছর পর যখন ওঁর শুভ সময় আসে, তখন উনি শিরডী পৌঁছন এবং বাবার দরবারে স্থায়ীরূপে সম্মিলিত হয়ে যান। ভাগ্যহীনদের সন্ত সমাগম

কিভাবে হতে পারে? কেবল তাঁরাই সৌভাগ্যবান, যাঁরা এ ধরনের সুযোগ পান।

সন্তদের দ্বারা লোকশিক্ষা ঃ-

সন্তদের দ্বারা লোকশিক্ষার কাজ চিরকাল থেকেই বিশ্বে সম্পাদিত হয়ে আসছে। সব সন্তরাই বিভিন্ন স্থানে কোন নিশ্চিত উদ্দেশ্য-পূর্তি হেতু স্বয়ং প্রকট হন। যদিও তাঁদের কার্য্যস্থল পৃথক হয়, তবুও মূলতঃ তাঁরা একই। তাঁরা সকলেই ঐ সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের সঞ্চালন শক্তির অন্তর্গত মিলিত ভাবেই কাজ করেন। একে অন্যের কাজের বিষয় অবগত থেকে প্রয়োজন অনুসারে পরস্পরের সাহায্য করেন। এর প্রমাণ নিম্নলিখিত ঘটনায় পাওয়া যায়।

শ্রী ঠাকুর ঃ-

শ্রী বি. এইচ. ঠাকুর (বি. এ) রাজস্ব বিভাগে কর্মচারী ছিলেন। উনি একবার জরিপ দলের সাথে কোন কাজে বেলগাঁওয়ের কাছে বডগাঁও নামক গ্রামে পৌঁছন। ওখানে উনি এক কানড়ী সন্তের (আপ্পা) দর্শন করে তাঁর চরণ বন্দনা করেন। আপ্পা তখন ভক্তদের নিশ্চলদাস কৃত 'বিচার সাগর' নামক গ্রন্থের (যেটি বেদান্তের বিষয় রচিত) ভাবার্থ বোঝাচ্ছিলেন। শ্রী ঠাকুর যখন তাঁর কাছে রওনা হওয়ার অনুমতি নিতে যান, তখন তিনি বলেন- "তোমার এই গ্রন্থটি অবশ্যই অধ্যয়ন করা উচিত এবং তা করলে, তোমার সমস্ত ইচ্ছা পূর্ণ হয়ে যাবে। যখন কালান্তরে কর্মসূত্রে তুমি উত্তর-পশ্চিম দিকে যাবে, তখন সৌভাগ্যবশতঃ তোমার এক মহান সন্তের সাথে দেখা হবে, যিনি তোমাকে পথ প্রদর্শন করে, হৃদয়ে শান্তি এবং সুখ প্রদান করবেন।"

পরে শ্রী ঠাকুরের স্থানান্তরণ জুন্নরে হয়, যেখানে নাহনে ঘাট পার হয়ে যেতে হত। এই ঘাটটি খুবই দুর্গম ও পার হওয়া কঠিন বলে মানা হয়। তাই ওঁকে মোষের পিঠে চড়ে, ঘাটটি পার করতে হয়। বলা বাহুল্য, তাতে ওঁর খুবই অসুবিধে ও কষ্ট হয়। এরপর কল্যাণে উনি এক উচ্চ পদে স্থানান্তরিত হন এবং সেখানে নানাসাহেব চাঁদোরকরের সঙ্গে ওঁর পরিচয় হয়। ওঁর কাছে শ্রী ঠাকুর শ্রী সাইবাবার সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারেন এবং তার সাথে-সাথে ওঁর বাবার দর্শন করার তীব্র আকাংখা জাগে। পরের দিনই নানাসাহেবের শিরডী রওনা হওয়ার কথা। উনি শ্রী ঠাকুরকেও শিরডী যেতে বলেন। কিন্তু ঠানের আদালতে একটা মামলার কাজে ওঁর উপস্থিতি অনিবার্য হওয়ার দরুণ উনি নানাসাহেবের সাথে যেতে পারেন না। তাই নানাসাহেব একলাই রওনা হন। এদিকে শ্রী ঠাকুর আদালতে পৌঁছে জানতে পারেন যে, মোকদ্দমার তারিখ পিছিয়ে গেছে। তখন নানাসাহেবের কথা না শোনার জন্য ওঁর খুব অনুতাপ হয়। এরপর উনি একাই শিরডী পৌঁছান এবং জানতে পারেন যে, নানাসাহেব তার আগের দিনই ফিরে গেছেন। উনি কয়েকজন বন্ধুর সাথে শ্রী সাইবাবাকে দর্শন করতে যান। বাবার দর্শন পেয়ে ও তাঁর চরণে প্রণিপাত করে অত্যন্ত আনন্দিত হন। চোখ থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে থাকে। ত্রিকালদর্শী বাবা ওঁদের দেখে বলেন- "এখানকার রাস্তা অত সহজ নয়, যতটা কানড়ী সন্ত আপ্পার উপদেশ বা নাহনে ঘাটে মোষের পিঠে যাত্রা। আধ্যাত্মিক পথে চলার জন্য ঘোর পরিশ্রম করতে হবে, কারণ এটি অত্যন্ত কঠিন পথ।" শ্রী ঠাকুর এই শব্দগুলি শুনে, যার অর্থ উনি ছাড়া আর কেউ জানলেন না, আনন্দে বিভোর হয়ে ওঠেন এবং ওঁর কানড়ী সন্তের কথা মনে পড়ে যায়। তখন উনি দুটি হাত

জুড়ে, বাবার পায়ে নিজের মাথাটি রেখে, তাঁর কাছে প্রার্থনা করেন যে- "প্রভু, আমার উপর কৃপা করুন এবং এই অনাথকে নিজের চরণের শীতল ছায়ায় স্থান দিন।" তখন বাবা বলেন- "যা কিছু আপ্পা বলেছিলেন সে সবই সত্য। সেগুলি নিত্য অভ্যাস করে, সেই অনুসারে ব্যবহার করা উচিত। মিছি-মিছি বসে থেকে, কোন লাভ হবে না। **যা কিছু তুমি পড়ো, সেটা আচরণের মাধ্যমে অনুসরণ করো,** নাহলে তার উপযোগিতাটাই বা কি? গুরু-কৃপা ছাড়া গ্রন্থাবলোকন ও আত্মানুভূতি নিরর্থক।" শ্রী ঠাকুর এযাবৎ 'বিচার সাগর' গ্রন্থে কেবল সিদ্ধান্তিক প্রকরণই পড়েছিলেন, তার বাস্তব প্রয়োগের রাস্তা উনি শিরডীতে জানতে পারলেন। আরেকটি ঘটনা এই সত্যের অকাট্য প্রমাণ দেয়।

শ্রী অনন্তরাও পাটন্‌কর ঃ-

পুণের এক ভদ্রলোক শ্রী অনন্তরাও পাটন্‌কর শ্রী সাইবাবার দর্শনাভিলাষী ছিলেন। শিরডী এসে বাবার দর্শন করে ওঁর নেত্র শীতল হয় ও মন আনন্দিত হয়ে ওঠে। যথোচিত পূজো করে উনি বাবার চরণ ছুঁয়ে বলেন- "আমি অনেক কিছু পড়েছি। বেদ, বেদান্ত ও উপনিষদও অধ্যয়ণ করেছি এবং পুরাণও শ্রবণ করেছি, তবুও মনের শান্তি পাইনি। তাই আমার শাস্ত্রপাঠ বৃথাই হল। একটি বিশুদ্ধ, নিরক্ষর ভক্ত আমার চেয়ে অনেক বেশী শ্রেষ্ঠ। যতক্ষন মনের শান্তি না পাওয়া যায়, ততক্ষন গ্রন্থাবলোকন বা বইপড়া বিদ্যেতে কোন লাভ নেই। আমি শুনেছি যে, আপনি কেবলমাত্র নিজের দৃষ্টি ও মনোজ্ঞ বচন দ্বারা লোকেদের মনে সহজেই শান্তিস্থাপন করে দেন। তাই শুনে আমিও এখানে এসেছি। কৃপা করে এই দাসকেও আশীর্বাদ

দিন।" তখন বাবা নিম্নলিখিত কাহিনীটি বলেন-

ঘোড়ার নাদির নটা গুলি (নবধা ভক্তি) ঃ-

"এক সময় এক সদাগর এখানে আসে। ওর সামনেই একটি ঘোটকী গোবর নির্গত করে। জিজ্ঞাসু সদাগর নিজের ধুতির এক কোণ বিছিয়ে তাতে নাদির ন'টা গুলি রেখে নেয় এবং এইভাবে ওর মন শান্ত হয়।" শ্রী পাটন্‌কর এই কাহিনীটির কোনই অর্থ বুঝতে পারেন না। তাই উনি শ্রী গণেশ দামোদর ওরফে দাদা কেলকরকে জিজ্ঞাসা করেন- "বাবার কথার অভিপ্রায় কি হতে পারে?" কেলকর বলেন- "বাবা যা কিছু বলেন, সেটা আমি নিজেও ভালোভাবে বুঝতে পারি না। কিন্তু তাঁরই প্রেরণায় আমি যা বুঝতে পেরেছি, সেটা তোমায় বলছি। ঘোটকী হলো ঈশ্বর-কৃপা এবং ন'টি গুলি হচ্ছে নবধা ভক্তি। ১) শ্রবণ, ২) কীর্তন, ৩) নামস্মরণ, ৪) পাদসেবন, ৫) অর্চন, ৬) বন্দন, ৭) দাস্যতা, ৮) সখ্যতা, ৯) আত্মনিবেদন- এইগুলি হলো ভক্তির ন'টি প্রকার। এর মধ্যে থেকে যদি একটাও, নির্ভুল ভাবে বা যথার্থরূপে অনুসরণ করা হয়, তাহলে ভগবান শ্রীহরি অতি প্রসন্ন হয়ে ভক্তের বাড়ীতে প্রকট হবেন। সমস্ত সাধন, যেমন- জপ, তপ, যোগাভ্যাস এবং বেদ পাঠ যতক্ষন ভক্তি দ্বারা আচ্ছাদিত না হয়, ততক্ষন সব কিছু শুষ্কই থেকে যায়। ভক্তি ভাবের অভাবে বেদজ্ঞানী বা ব্রহ্মজ্ঞানীর খ্যাতি নিরর্থকই মানা উচিত। প্রয়োজন কেবল পূর্ণ ভক্তির। নিজেকেও ঐ সদাগরের ন্যায় মনে করে উৎকণ্ঠাপূর্বক সত্যের খোঁজ করে ন' প্রকারের ভক্তি প্রাপ্ত করো। তখন তুমি দৃঢ়তা ও মানসিক শান্তি লাভ করবে।" পরের দিন, যখন শ্রী পাটন্‌কর বাবাকে প্রণাম করতে যান, তখন বাবা ওঁকে জিজ্ঞাসা করেন- "কি,

তুমি নাদির ন'টা গুলি জোগাড় করলে?" উনি জবাব দেন যে, তিনি অতি দীন। বাবার কৃপা ছাড়া তাঁর পক্ষে সেগুলি সহজে একত্রিত করা সম্ভব নয়। বাবা তখন ওঁকে আশীর্বাদ দিয়ে সান্ত্বনা দেন- "তুমি সুখ ও শান্তি লাভ করবে।" এই কথা শুনে শ্রী পাটন্‌করের আনন্দের সীমা রইল না।

পণ্ঢরপুরের উকিল ঃ-

ভক্তদের দোষ দূর করে, বাবা তাদের সঠিক পথে নিয়ে আসতেন। এই বিষয়ে তাঁর ত্রিকালজ্ঞতার একটি ছোট কাহিনী দিয়ে এই অধ্যায়টি শেষ করা হবে। এক সময় পণ্ঢরপুর থেকে এক উকিল শিরডী আসেন। বাবাকে দর্শন করে প্রণাম করেন। কিছু দক্ষিণা দিয়ে এক কোণে বসে কথাবার্তা শুনছিলেন। বাবা ওঁর দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করেন- "লোকেরা কত ধূর্ত! এখানে এসে পা ছোঁয় আর দক্ষিণা দেয়, কিন্তু আড়ালে গাল দেয়। কি আশ্চর্য্যের কথা, তাই না?" এই কথাটি উকিলকে ইঙ্গিত করে বলেন এবং ওঁকে সেটা হজম করতে হয়। আর কেউ এই শব্দগুলির অর্থ বুঝতে পারে না। কিন্তু উকিল সাহেব এর গূঢ়ার্থ বুঝতে পারেন এবং নতশির হয়ে সেখানে বসে থাকেন। 'ওয়াড়া'য় ফিরে উকিল মহাশয় কাকাসাহেব দীক্ষিতকে বলেন- "বাবা যে কথাটি আমার দিকে লক্ষ্য করে বলেন, সেটা সত্যই। তিনি আমায় সতর্ক করেন যে, আমার কারো নিন্দে করা উচিত নয়। একবার উপন্যায়াধীশ শ্রী নুলকর স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য পণ্ঢরপুর থেকে শিরডী আসেন। এই নিয়ে বাররুমে ওঁর সম্বন্ধে বেশ আলোচনা হয়। সমালোচনার বিষয় ছিল- যে রোগে উনি ভুগছেন, সেটা কি ওষুধ না খেয়ে, কেবল শ্রী সাইবাবার শরণে গেলেই ঠিক হয়ে যাবে? এবং শ্রী নুলকরের মতো একজন শিক্ষিত ব্যক্তির

কি এই ধরনের পথ অবলম্বন করা উচিত? ঐ সময় শ্রী নুলকরের সাথে-সাথে, শ্রী সাইবাবারও উপহাস করা হয়। আমিও সেই আলোচনায় যোগ দিই। শ্রী সাইবাবা আমার সেই দূষিত আচরণের উপর আলোকপাত্ করলেন। এইটি আমার উপহাস নয়, বরং উপকার। তিনি আমায় উপদেশ দিলেন **যে অযথা পরচর্চা বা পরনিন্দা করা উচিত নয়। অন্যদের কাজে বাধা দিয়ে কোন লাভ হয় না।"**

শিরডী ও পণ্ঢরপুরের মধ্যে প্রায় **৩০০** মাইলের দূরত্ব। তবুও বাবা তাঁর সর্বজ্ঞতার প্রভাবে, 'বাররুমে' যা কিছু ঘটেছিল সেটা ভালো ভাবেই জানতেন। রাস্তায় নদী, জঙ্গল বা পাহাড় তাঁর সর্বজ্ঞতায় কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারে নি। তিনি সবার হৃদয়ের গোপন কথা জানতেন এবং তাঁর কাছে কিছুই লুকানো থাকে নি। কাছের বা দূরের বস্তু তাঁর কাছে দিনের আলোর ন্যায় জাজ্বল্যমান ছিল এবং তাঁর সর্বব্যাপক দৃষ্টি থেকে কিছুই আড়াল থাকতে পারত না। এই ঘটনার দ্বারা উকিল মহাশয় এই শিক্ষা পান যে, **কখনও কারো ছিদ্রান্বেষণ অথবা নিন্দে করা উচিত নয়।** এই ঘটনাটি শুধু উকিল সাহেবের জন্যই নয়, বরং সবার জন্য শিক্ষাপ্রদ। শ্রী সাইবাবার মহানতা কেউই মাপতে পারেনি, আর তাঁর অদ্ভুত লীলার কোন সীমাও খুঁজে পায়নি। তাঁর জীবনীও তদোনুরূপই, কারণ তিনি স্বয়ং পরমব্রহ্ম।

।। শ্রী সাঁইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

সপ্তাহ পারায়ণ ঃ তৃতীয় বিশ্রাম

অধ্যায় - ২২

সর্প-দংশন হতে রক্ষা- ১) শ্রী বালাসাহেব মিরীকর, ২) শ্রী বাপুসাহেব বুটী, ৩) শ্রী আমীর শক্কর; শ্রী হেমাডপন্ত, বাবার মতামত

সাপ মারার বিষয়ে বাবার পরামর্শ ঃ-

শ্রী সাইবাবার ধ্যান কি ভাবে করা যেতে পারে? ঐ সর্বশক্তিমানের প্রকৃতি বা স্বরূপ অত্যন্ত গভীর - যার বর্ণনা করতে বেদ এবং সহস্রমুখী অনন্তনাগও অক্ষম। ভক্তদের অনুরাগ তাঁর স্বরূপ বর্ণনায় তৃপ্ত হয় না। ওদের তো দৃঢ় ধারণা যে, কেবল বাবার শ্রীচরণেই আনন্দ প্রাপ্তি সম্ভব। তাঁর চরণের ধ্যান ছাড়া, জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্যপ্রাপ্তির অন্য কোন পথ তাদের জানা নেই। হেমাডপন্ত ভক্তি ও ধ্যানের এক অতি সরল পথ উল্লেখ করছেন -

কৃষ্ণ পক্ষ আরম্ভ হতেই চন্দ্রমা প্রতি দিন ক্রমশঃ ছোট হতে থাকে এবং তার কিরণও ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে থাকে। শেষে অমাবস্যার, দিন চাঁদ সম্পূর্ণ বিলীন থাকায়, চারিদিকে রাতের ভয়ঙ্কর অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ে। তাই শুক্লপক্ষ শুরু হতেই, সবাই চন্দ্রদর্শনের জন্য উৎসুক হয়ে ওঠে। এরপর দ্বিতীয়ায় চাঁদ যখন স্পষ্ট দেখা যায় না, তখন লোকেদের গাছের দু'টি শাখার মাঝখান থেকে চাঁদ দেখতে বলা হয়। যখন এই ভাবে শাখাগুলির মাঝখান থেকে একাগ্র হয়ে চাঁদ দেখার চেষ্টা করা হয়, তখন দূরে আকাশে ছোট্ট চন্দ্রর রেখা দৃষ্টিগোচর হতেই মন অতি প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। এই সিদ্ধান্ত অনুসরণ করেই আমাদের বাবার শ্রীদর্শনের চেষ্টা করা উচিত। বাবার ছবির দিকে দেখো! আহা, কত সুন্দর! তিনি পা মুড়ে বসে আছেন এবং

ডান পা টি বাঁ হাঁটুর উপর রাখা। বাঁ হাতের আঙ্গুলগুলি ডান পায়ের উপর ছড়ান রয়েছে। তর্জনী ও মধ্যমার ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে, তাঁর ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুল। এই ভঙ্গীমার দ্বারা বাবা বোঝাতে চাইছেন- যদি তুমি আমার আধ্যাত্মিক দর্শন করতে ইচ্ছুক তাহলে অভিমানশূণ্য ও বিনম্র হয়ে উক্ত দুই আঙ্গুলের মাঝখান দিয়ে দেখা আমার চরণের আঙ্গুলের ধ্যান করো। তবেই তুমি সেই সত্য-স্বরূপ দর্শন করতে সফল হবে। ভক্তি প্রাপ্ত করার এটাই সব চেয়ে সরল পথ।" এবার আসুন, একটু শ্রী সাইবাবার জীবনী আলোচনা করি। শিরডী জায়গাটি বাবার অবস্থানের ফলস্বরূপই তীর্থস্থল হয়ে ওঠে। চারিদিক দিয়ে লোকেদের ভীড় দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে এবং ধনী ও নির্ধন সবারই কোন-না-কোন ভাবে লাভ হচ্ছে। বাবার অসীম প্রেম, তাঁর অদ্ভুত জ্ঞান ভাণ্ডার এবং সর্বব্যাপকতার বর্ণনা করার সামর্থ্য কার আছে? ধন্য তো সে-ই, যে বাবার একটি বা সবকটি গুণের অনুভূতি পেয়েছে। কখনো-কখনো তিনি ব্রহ্মে লীন থাকায় দীর্ঘ সময় অবধি মৌনভাব ধারন করে থাকতেন। আবার কোন-কোন সময়, এই চৈতন্যধন ও আনন্দ-মূর্তি ভক্তদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতেন। কখনো দৃষ্টান্ত দিতেন তো কখনো হাসি-ঠাট্টা করতেন। কখনো সরল-স্বাভাবিক চিত্তে থাকতেন তো কখনো ক্রুদ্ধ হয়ে যেতেন। তাঁর শ্রীমুখের দর্শন, তাঁর সাথে কথাবার্তা বলা এবং লীলা শোনবার ইচ্ছে সদা অতৃপ্তই থেকে যেত। তবুও আমাদের আনন্দের সীমা ছিল না। বৃষ্টির জলবিন্দুর গণনা হতে পারে, বাতাসকে চামড়ার থলিতে ভরে রাখা যায়, কিন্তু বাবার লীলার থৈ অথবা কূল-কিনারা কেউ পেতে পারবে না। এবার তার থেকে একটি লীলা শ্রবণ করুন। ভক্তদের বিপদের কথা আগেই জেনে, বাবা তাদের সময়মতো সতর্ক করে দিতেন। শ্রী বালাসাহেব মিরীকর (সর্দার কাকাসাহেবের সুপুত্র ও

কোপরগাঁও-য়ের মাম্‌লৎদার) একবার সরকারী কাজে চিত্‌লী যাচ্ছিলেন। সেই সময় পথে (শিরডীতে) শ্রী বাবার দর্শনার্থে উপস্থিত হন। মস্‌জিদে গিয়ে বাবার চরণ বন্দনা করেন এবং প্রতি বারের ন্যায় স্বাস্থ্য ও অন্যান্য বিষয় আলোচনা শুরু হয়। বাবা ওঁকে সতর্ক করে বলেন-**"তুমি যেখানে বসে আছো, সেটাই দ্বারকামাঈ। তিনি নিজের সন্তানদের সমস্ত দুঃখ এবং বিপদ আপদ দূর করে দেন। এই মস্‌জিদ মা পরম কৃপাময়ী। তিনি সরল হৃদয়ের ভক্তদের সমস্ত বিপদ থেকে অবশ্যই রক্ষা করবেন। তাঁর কোলে যে একবার বসে, তার সমস্ত কষ্ট দূর হয়ে যায়। যে তাঁর ছত্রছায়ায় বিশ্রাম করে, সে আনন্দিত ও সুখী হয়।"** এর পর বাবা ওঁকে আশীর্বাদ দেন।

শ্রী বালাসাহেব রওনা হওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াতে, বাবা বলেন- " তুমি কি লম্বা বাবাকে (অর্থাৎ সাপ) চেনো?" এবং নিজের বাঁ মুঠো বন্ধ করে ডান কনুইয়ের কাছে এনে হাতটাকে সাপের মত নাড়িয়ে বললেন- "এ বড়ই ভয়ঙ্কর, কিন্তু দ্বারকামাঈয়ের সন্তানদের সে কি ক্ষতি করতে পারে? যখন স্বয়ং দ্বারকামাঈ ওদের রক্ষা করেন, তখন সাপের সামর্থই বা কি?" সেখানে উপস্থিত লোকেরা এবং মিরীকর এই ভাবে সাবধান করার কারণ জানতে চাইছিলেন; কিন্তু জিজ্ঞাসা করার সাহস কারো হচ্ছিল না। বাবা শামাকে মিরীকরের সাথে চিতলী যেতে আদেশ দেন। বালাসাহেবকে শামা এই খবরটি দিতেই, বালাসাহেব বলেন- "পথে অনেক অসুবিধে হতে পারে। তাই শুধু-শুধু আপনার কষ্ট করার কি দরকার?" বালাসাহেবের মত

শামা বাবাকে জানান। বাবা বলেন- "আচ্ছা, ঠিক আছে, যেও না। **যাতে ভালো হয় সেই রকম কাজই করা উচিত। যা ঘটবার, সে তো ঘটবেই।"** এরপর বালাসাহেব খানিকক্ষণ চিন্তা করে শামাকে তাঁর সাথে চিত্‌লী যেতে অনুরোধ করেন। তখন আবার বাবার অনুমতি নিয়ে শামা বালাসাহেবের সাথে টাঙ্গায় রওনা হন। ওঁরা ন'টায় চিত্‌লী পৌঁছান ও মারুতি মন্দিরে গিয়ে ওঠেন। দপ্তরে কর্মচারীরা তখনও এসে পৌঁছয়নি বলে, ওঁরা এদিক-ওদিককার কথা বলতে লাগলেন। বালাসাহেব মাদুরের উপর দৈনিক পত্র নিয়ে শান্ত হয়ে বসেছিলেন। ওঁর ধূতির উপরের অংশটি কোমরের কাছে পড়েছিল। তার এক ভাগের উপর একটা সাপ বসেছিল। কারো চোখ সেদিকে যায়নি। ওদিকে সাপটা হিস্‌-হিস্‌ শব্দ করতে-করতে এগিয়ে চলে। এই আওয়াজটা শুনে চাপড়াশীটা দৌড়ে আসে। সাপ দেখে সে 'সাপ - সাপ' বলে উচ্চস্বরে চেঁচাতে শুরু করে। বালাসাহেব অত্যন্ত ভয় পেয়ে কাঁপতে শুরু করেন। শামাও হতবাক্‌ হয়ে যান। উনি ও অন্যান্য উপস্থিত লোকেরা ধীরে-ধীরে সেখান থেকে সরে গিয়ে, হাতে লাঠি নিয়ে প্রস্তুত হলেন। সাপটা ধীরে-ধীরে কোমর থেকে নীচে নেমে এল। সঙ্গে সঙ্গেই ওটাকে মেরে ফেলা হল। বাবা যে বিপদের ভবিষ্যবাণী করেছিলেন, সেটা এই ভাবে কেটে গেল। বলা বাহুল্য, সাই চরণে বালাসাহেবের প্রেম আরও দৃঢ় হয়ে উঠল।

বাপু সাহেব বুটী ঃ-

একদিন মহান জ্যোতিষী শ্রী নানাসাহেব ডেঙ্গলে বাপুসাহেব বুটীকে (যিনি সেই সময় শিরডীতেই ছিলেন) বলেন- "আজকের

দিনটা তোমার জন্য অত্যন্ত অশুভ এবং তোমার জীবন সংকটাপন্ন।" এই কথা শুনে বাপু সাহেব অত্যন্ত অস্থির হয়ে ওঠেন। প্রতিদিনের ন্যায় যখন উনি বাবার দর্শন করতে যান, তখন বাবা ওঁকে জিজ্ঞাসা করেন- "নানা কি বলছে? ও তোমার মৃত্যুর ভবিষ্যবাণী করছে? কিন্তু তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই।" সন্ধ্যাবেলায় বুটীসাহেব নিজের শৌচ-গৃহে একটা সাপ দেখতে পান। ওঁর চাকরও সাপটা দেখতে পেয়ে, সেটাকে মারবার জন্য একটা পাথর তুলে নেয়। বাপুসাহেব একটা লম্বা লাঠি আনতে পাঠান। কিন্তু লাঠি আনার আগেই, সাপটা চলতে শুরু করে এবং শীঘ্রই অদৃশ্য হয়ে যায়। বাবার অভয়বাণীর কথা স্মরণ করে বাপুসাহেব খুবই খুশী হন।

অমীর শক্কর ঃ-

কোরলে গ্রামের (তালুক কোপরগ্রাম) আমীর শক্কর নামে এক গ্রাম্য মুচি ছিল। সে বান্দ্রাতে দালালীর কাজ করতো। প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে তার গণনা করা হতো। একবার সে গেঁটে বাত রোগে কষ্ট পাচ্ছিল। যখন 'খোদা'র কথা মনে পড়ে, তখন সে কাজ-কর্ম ছেড়ে শিরডী চলে আসে এবং বাবার কাছে আরোগ্য প্রার্থনা করে। তখন বাবা ওকে 'চাওড়ী'-তে থাকতে আজ্ঞা দেন। 'চাওড়ী' সে সময় একটি অস্বাস্থ্যজনক জায়গা হওয়ার দরুণ, এই ধরনের রোগীদের জন্য একেবারেই অনুপযুক্ত। গ্রামের অন্য যে কোন জায়গা তার জন্য বেশী ভালো হতে পারত। কিন্তু বাবার কথাই এখানে একমাত্র হুকুম ও মুখ্য ঔষধি। বাবা ওকে মস্‌জিদে আসতে দিতেন না ও 'চাওড়ী'-তেই থাকতে বলেন। সেখানে থেকে ওর খুব লাভ হয়। বাবা ভোরবেলা ও সন্ধ্যাবেলায় 'চাওড়ী'-র পাশ দিয়ে হয়ে যেতেন এবং একদিন অন্তর শোভাযাত্রার সাথে সেখানে আসতেন ও বিশ্রাম

করতেন। তাই আমীরও বাবার সান্নিধ্য সহজেই পেয়ে যেত। আমীর সেখানে পুরো ন' মাস ছিল। কিন্তু এক সময় ওর কোন এক অন্য কারণে ওখানে থাকতে-থাকতে বিরক্তি ধরে যায়। তাই সেই জায়গাটি ছেড়ে, চুপিচুপি সে কোপরগ্রামের এক ধর্মশালায় এসে ওঠে। সেখানে একটি ফকির ওর কাছে জল চায়। লোকটির প্রায় মরো মরো অবস্থা। আমীর তাকে জল দেয় এবং জলটা খেতেই সে মারা যায়। এবার আমীর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। একবার মনে হয় - ধর্মশালার অধিকারীদের এ বিষয়ে খবর দেওয়া উচিত। কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাবে- "প্রথম ও একমাত্র সংবাদদাতা হিসেবে আমিই ধরা পড়ব।" এইবার অনুমতি না নিয়ে শিরডী ছাড়ার জন্য আমীর সত্যি-সত্যিই অনুতপ্ত বোধ করছিল। বাবার কাছে মনে মনে প্রার্থনা করে ও বাবার নাম নিতে-নিতে সূর্য্য উদয় হওয়ার আগেই শিরডী পৌঁছে চিন্তামুক্ত হয়ে যায়। তারপর ও 'চাওড়ী'তে বাবার ইচ্ছে ও আজ্ঞানুসারে থাকতে শুরু করে এবং শীঘ্রই রোগমুক্ত হয়ে যায়। একবার মাঝ রাতে বাবা জোরে ডাক দেন- "ও আব্দুল! কোন দুষ্ট প্রাণী আমার বিছানায় উঠেছে।" আব্দুল লণ্ঠন নিয়ে বাবার বিছানা নিরীক্ষণ করে, কিন্তু সেখানে কিছু পাওয়া যায় না। বাবা ভালোভাবে সমস্ত জায়গাটি দেখতে বলেন। তিনি নিজের ডাণ্ডাটাও মেঝেতে ঠোকেন। বাবার এই লীলা দেখে আমীরের মনে হয় যে, বাবা বোধহয় কোন সাপের আশঙ্কা করছেন।

দীর্ঘকাল বাবার সাথে থাকার দরুন আমীর বাবার কথা বা ইঙ্গিত বুঝতে পারত। হঠাৎ নিজের বিছানার কাছে ও কিছু একটা নড়তে দেখে। আব্দুলকে লণ্ঠনটা আনতে বলে। সেই আলোয় দেখা যায় যে, একটা সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে আছে। তক্ষুনি সেটাকে মেরে

ফেলা হয়। এই ভাবে বাবা সময় মতন সতর্ক করে আমীরের প্রাণ রক্ষা করেন।

বিছে ও সাপ ঃ-

১) বাবার আজ্ঞানুসারে, কাকাসাহেব দীক্ষিত শ্রী একনাথ মহারাজের দুটি গ্রন্থ - ভাগবৎ ও ভাবার্থ রামায়ণ নিত্য পাঠ করতেন। একবার যখন কাকাসাহেব রামায়ণ পাঠ করছিলেন, সেই সময় হেমাডপন্তও শ্রোতাদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন। নিজের মা'য়ের আদেশানুসার হনুমান কিভাবে শ্রীরামের শ্রেষ্ঠতার পরীক্ষা নেন - এই প্রসঙ্গটার পাঠ চলছিল। সবাই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছিল ও হেমাডপন্তেরও অবস্থা একই। হঠাৎ কোথা থেকে একটা বিছে ওঁর কাঁধের উপর এসে বসে, কিন্তু সেদিকে ওঁর কোনই খেয়াল ছিল না। কিন্তু ঈশ্বরকে স্বয়ং শ্রোতাদের রক্ষা করতে হয়। হঠাৎ ওঁর চোখ কাঁধের উপর পড়ে এবং তখন উনি বিছেটাকে দেখতে পান। তাকে দেখে মৃতপ্রায় মনে হচ্ছিল - যেন সেও কথার আনন্দে তন্ময় হয়ে গেছে। হরি ইচ্ছা জেনে ও পাঠে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি না করে, হেমাডপন্ত বিছেটাকে নিজের ধুতির দুই আগায় জড়িয়ে দূরে বাগান ফেলে আসেন।

২) আরেকবার সন্ধ্যার সময় কাকাসাহেব নিজের 'ওয়াড়া'তে বসে ছিলেন। ঠিক সেই সময় গর্তের মধ্যে দিয়ে একটা সাপ সেখানে ঢুকে গুটিয়ে রইল। আলো আনাতে প্রথমটায় একটু চমকে যায়, কিন্তু পরে সেখানেই চুপটি করে বসে থাকে। অনেকেই লাঠি ইত্যাদি নিয়ে ছুটে আসে, কিন্তু সে এমন একটা সুরক্ষিত স্থানে বসেছিল যে, সেখানে কারো মারের কোন লাভ হত না। লোকেদের

হৈ-চৈ শুনে সাপটা তাড়াতাড়ি সেই গর্তটার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর সবাই একটু শান্তি পেলো।

বাবার মতামত ঃ-

একজন ভক্ত, মুক্তারাম বলল- "যাক্, ভালোই হল। একটি প্রাণীর প্রাণ তো বাঁচল।" শ্রী হেমাডপন্ত তার কথা অস্বীকার করে বলেন- "সাপ জাতীয় জীবদের মেরে ফেলাই উচিত।" এই ভাবে এই বিষয়ে তর্কাতর্কি শুরু হয়ে গেল। এক দলের মত সাপ ও তার মত জন্তুদের মেরে ফেলাই উচিত। অন্য দলের মত এর ঠিক বিপরীত। রাত অনেক হয়ে গিয়েছিল, তাই কোন সিদ্ধান্তে না পৌঁছেই বিবাদ স্থগিত করতে হলো। পরের দিন এই প্রশ্নটি বাবার সামনে তোলা হয়। তখন বাবা নিষ্পত্তি করে জানালেন- "সব জীব ও প্রাণীদের মধ্যে ঈশ্বর বাস করেন - তা সে সাপ হোক্ বা বিছে। তিনিই এই বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ কর্তা এবং প্রত্যেকটি প্রাণী যেমন সাপ, বিছে, ইত্যাদি তাঁর আজ্ঞাই পালন করে। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে, কেউ কারো ক্ষতি করতে পারে না। তাই আমাদের সব প্রাণীদের ভালোবাসা উচিত, করুণা করা উচিত। সংঘর্ষ ও বৈষম্য বা মারামারি ছেড়ে, শান্ত মনে জীবন যাপন করা উচিত। ঈশ্বর সবাইকে রক্ষা করেন।"

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

অধ্যায় - ২৩

যোগ ও পেঁয়াজ, শামার সর্পদংশন থেকে আরোগ্যলাভ, বিসুচিকা (কলেরা) নিবারণার্থে নিয়মের উল্লংঘন, গুরুভক্তির কঠিন পরীক্ষা।

প্রস্তাবনা ঃ-

বাস্তবে মানুষ ত্রিগুণময় (তিন গুণ অর্থাৎ সত্ব-রজ-তম) কিন্তু মায়ার প্রভাবে তার ধারণা হয় যে 'আমি শরীর বা দেহ'। দৈহিক বুদ্ধির আবরণে তার ধারণা হয় যে, 'আমি কর্তা ও ভোগী'। এইভাবে মানুষ অনেক রকম বন্ধনে নিজেকে জড়িয়ে নেয়। তারপর আর মুক্তির কোন পথ খুঁজে পায় না। **মুক্তির একমাত্র উপায় হচ্ছে, গুরুর শ্রীচরণে অটল প্রেম ও ভক্তি।** মহানায়ক ভগবান সাই ভক্তদের পূর্ণ আনন্দ প্রদান করে, নিজ স্বরূপে তাদের রূপান্তরিত করেছিলেন। **এই জন্য আমরা শ্রী সাইবাবাকে ঈশ্বরেরই অবতার মানি।** কিন্তু তিনি সর্বদা বলতেন যে- "আমি তো ঈশ্বরের এক দাস।" ঈশ্বর-অবতার হওয়া সত্ত্বেও, মানুষদের কিরূপ আচরণ করা উচিত এবং নিজের বর্ণের কর্তব্যগুলি কিভাবে পালন করা উচিত, তারই উদাহারণ তিনি লোকেদের সামনে প্রস্তুত করেন। তিনি কারো সাথে কোন রকমের প্রতিদ্বন্দিতা করেননি আর কারো কোন ক্ষতিও করেননি। যিনি সব জড় ও চেতন পদার্থে ঈশ্বরকেই দর্শন করতেন, তাঁর পক্ষে বিনম্র হওয়াই স্বাভাবিক। তিনি কাউকে উপেক্ষা বা অশ্রদ্ধা করেন নি, সদাই বলতেন- "আমি ঈশ্বরের এক দাস।" **"আল্লাহ মালিক", এটিই সর্বক্ষণ উচ্চারন করতেন।** আমরা অন্যান্য

সন্তদের সাথে পরিচিত নই, আর এও জানি না যে তাঁরা কি রূপ আচরণ করতেন অথবা তাঁদের দিনচর্যা ইত্যাদি কি ছিল? ঈশ্বর কৃপায় শুধু এতটাই জানি যে, তাঁরা অজ্ঞান ও বদ্ধ জীবদের জন্য অবতীর্ণ হন। **শুভ কর্মের ফলস্বরূপই আমাদের সন্ত কথা এবং লীলা শ্রবণ করার ইচ্ছা জন্মায়, তাছাড়া নয়।** এবার আমরা মুখ্য কাহিনীর দিকে আসি।

যোগ এবং পেঁয়াজ ঃ-

একবার একজন যোগাভ্যাসী নানাসাহেব চাঁদোরকরের সাথে শিরডী আসেন। উনি পাতঞ্জলি যোগসূত্র ও যোগশাস্ত্রের অন্যান্য গ্রন্থও বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন, কিন্তু ব্যবহারিক অনুভব হতে বঞ্চিত ছিলেন। মন একাগ্র না হওয়ার দরুণ, অল্পক্ষণের জন্যও ধ্যানে সমাধিমগ্ন হতে পারতেন না। যদি বাবার কৃপা হয়, তাহলে তাঁর কাছে দীর্ঘ সমাধি অবস্থা প্রাপ্তির বিধি জানা যেতে পারে, এই ধারণা নিয়ে উনি শিরডী আসেন। মস্‌জিদে পৌঁছে দেখেন যে, বাবা রুটি আর পেঁয়াজ খাচ্ছেন। এই দেখে ওঁর মনে হয় যে, বাসি রুটি আর কাঁচা পেঁয়াজ খান যে, এমন ধরনের লোক আমার সমস্যা কি ভাবে দূর করবে?" বাবা অন্তর্জ্ঞান দিয়ে ওঁর মনের কথা জেনে তক্ষুনি নানাসাহেবকে বলেন- "ও নানা, যার পেঁয়াজ হজম করার শক্তি আছে, তারই সেটা খাওয়া উচিত, অন্যদের নয়।" এই শব্দগুলি শুনে যোগী অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে, বাবার চরণে আত্মসমর্পণ করেন। শুদ্ধ ও নিষ্কপট ভাবে নিজের সমস্যাগুলি বাবার সামনে রেখে, তাদের সমাধান প্রাপ্ত করেন। এই ভাবে সন্তুষ্ট ও সুখী হয়ে, বাবার দর্শন করে ও উদী নিয়ে তিনি শিরডী থেকে প্রস্থান করেন।

সর্পদংশন থেকে শামার আরোগ্যলাভ ঃ-

কাহিনীটি শুরু করার আগে হেমাডপন্ত লিখছেন যে, জীবের তুলনা পোষা টিয়া পাখীর সাথে করা যায়। কেননা দুজনই বদ্ধ। একজন শরীরে তো অন্যজন খাঁচায়। দুজনেই নিজের বদ্ধ অবস্থাকে নিজের জন্য ভালো মনে করে। কিন্তু যদি হরিকৃপায় তারা কোন খাঁটি গুরুর শরণাপন্ন হতে পারে, তাহলে তিনি তাদের জ্ঞানচক্ষু খুলে বন্ধনমুক্ত করে দেন। তখন তাদের জীবনের স্তর অনেক উঁচু হয়ে যায়, যার তুলনায় আগের সংকীর্ণ অবস্থা একেবারেই তুচ্ছ মনে হয়।

গত অধ্যায়ে শ্রী মিরীকরের উপর আসন্ন বিপদের বিষয়ে সতর্ক করে কি ভাবে বাবা তাঁকে বাঁচিয়ে নেন - সেটাই বর্ণনা করা হয়েছে। পাঠকবৃন্দ এবার ঐ রকমেরই আরেকটি কথা শ্রবণ করুন। একবার শামাকে একটা বিষধর সাপ কামড়ে দেয়। সমস্ত শরীরে বিষ ছড়িয়ে পড়ায়, উনি খুবই কষ্ট পাচ্ছিলেন এবং আর্তনাদ করে বলছিলেন- "আমি আর বাঁচব না।" ওঁর বন্ধুরা ওঁকে ভগবান বিঠোবার মন্দিরে নিয়ে যেতে চাইছিলেন। এই ধরনের রোগীদের প্রায় সেখানেই নিয়ে যাওয়া হত। কিন্তু শামা মস্‌জিদের দিকে দৌড়ন, নিজের বিঠোবা শ্রী সাইবাবার কাছে। বাবা ওঁকে দূর থেকে দেখে গালি দিতে শুরু করেন। প্রচণ্ড রাগে বলতে লাগলেন- "যা, দূর হ', নীচে নাম।" শ্রী সাইবাবাকে এইরূপ রাগ করতে দেখে শামা অত্যন্ত বিপদে পড়ে যান এবং নিরাশ মনে ভাবেন- "কেবল মস্‌জিদই তো আমার বাড়ী এবং বাবা অসহায়ের আশ্রয়দাতা। যখন তিনিই আমাকে এখান থেকে এই ভাবে তাড়াচ্ছেন, তখন আর আমি কার শরণে যাই?" উনি নিজের জীবনের আশা ছেড়ে, ওখানেই শান্ত হয়ে বসে পড়েন। কিছুক্ষণ পর বাবার রাগ যখন শান্ত হয়, তখন শামা উপরে উঠে

বাবার কাছে গিয়ে বসেন। তখন বাবা বলেন- "ভয় পেও না, বিন্দুমাত্র চিন্তা করো না। দয়ালু ফকির তোমার রক্ষা নিশ্চয়ই করবেন। বাড়ী গিয়ে শান্ত হয়ে বসো এবং বাইরে বেরিও না। আমার উপর ভরসা রেখে নির্ভয় হয়ে চিন্তা ছেড়ে দাও।" ওঁকে বাড়ী পাঠিয়ে, তাত্‌য়া ও কাকাসাহেব দীক্ষিতকে দিয়ে বলে পাঠান- ও যা ইচ্ছে হয় খাক, কিন্তু শোয় না যেন।" বলা বাহুল্য, এই আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই শামা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন। এপ্রসঙ্গে একটা কথাই মনে রাখতে হবে যে, বাবা শব্দগুলি (পঞ্চক্ষরীয়, যা দূর হ', নীচে নাম) শামাকে লক্ষ্য করে বলেননি। এই আদেশটা দেন সাপটাকে ও তার বিষকে (অর্থাৎ শামার শরীরে বিষ না ছড়ায়, সেই আজ্ঞাই দিচ্ছিলেন)। অন্যান্য মন্ত্রশাস্ত্র বিশেষজ্ঞদের মতো মন্ত্র বা মন্ত্রোক্ত চাল বা জল ইত্যাদি ব্যবহার করেননি।

এই ঘটনাটি এবং এই ধরনের ঘটনা শুনে, এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে যায় যে, **যদি মায়াময় সংসার পার করতে চাও তাহলে হৃদয়ে শুধু সাইচরণ ধ্যান করো।**

বিসুচিকা মহামারী ঃ-

একবার শিরডী বিসুচিকার প্রকোপে কেঁপে ওঠে ও গ্রামবাসীরা অত্যন্ত ভয়ভীত হয়ে ওঠে। ওরা অন্য গ্রামের লোকেদের সাথে পারস্পরিক সম্বন্ধ বন্ধ করে দিল। গ্রামের পঞ্চায়েৎ দু'টো আদেশ জারী করে। প্রথম - কাঠ বোঝাই করা কোন গাড়ী গ্রামে ঢুকতে দেওয়া হবে না। দ্বিতীয়- কেউ ছাগল বলি দেবে না। এই আদেশ যে অমান্য করবে তাকে দণ্ড দেওয়া হবে। বাবা ত জানতেনই যে, এসব কেবল অন্ধ বিশ্বাস। তাই এই আদেশগুলির দিকে কান দেন না। আইন বলবৎ থাকাকালে, একদিন এক জ্বালানী কাঠের গাড়ী

গ্রামে ঢুকতে চাইল। সবাই জানত যে, গ্রামে কাঠের প্রচণ্ড অভাব ও প্রয়োজন। তবুও লোকেরা ঐ গাড়ীওয়ালাকে সেখানে থেকে তাড়িয়ে দিতে লাগল। বাবা এই কথাটা জানতে পেরে, স্বয়ং সেখানে এসে গাড়ীওয়ালাকে গাড়ীটা মস্‌জিদে নিয়ে যেতে বলেন। বাবার বিরুদ্ধে কেউ টুঁ শব্দটি করতে পারল না। আসলে ধুনির জন্য তাঁর কাঠের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। তাই তিনি গাড়ীর সমস্ত কাঠ কিনে নেন। একজন মহান অগ্নিহোত্রীর ন্যায় তিনি জীবনভোর ধুনি প্রজ্জ্বলিত রাখেন এবং তাই কাঠ জোগাড় করে রাখতেন।

বাবার বাড়ী অর্থাৎ মস্‌জিদ সবার জন্য খোলা থাকত। তার জন্য কোন তালা-চাবির দরকার ছিল না। গ্রামের গরীব লোকেরা বাবার ভাণ্ডার থেকে নিজেদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের জন্য কাঠ বার করে নিয়েও যেত, কিন্তু বাবা তাতে কখনো কোন আপত্তি করেননি। তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বকে ঈশ্বরেই ওতপ্রোত ভাবে জড়িত দেখতেন। তাই তাঁর মনে কারো প্রতি কোন ঘৃণা বা শত্রুতার ভাব ছিল না। পরম বৈরাগী হওয়া সত্ত্বেও তিনি এক সাধারণ গৃহস্থের উদাহরণ লোকেদের সামনে তুলে ধরেন।

গুরুভক্তির কঠিন পরীক্ষা ঃ-

এবার দেখা যাক, দ্বিতীয় আদেশটির বাবা কিরূপ দুর্দশা করেন। ঐ সময় মস্‌জিদে কেউ একজন একটা পাঁঠা বলি দেওয়ার জন্য আনে। পাঁঠাটার মৃতপ্রায় অবস্থা। এই সময় মালেগাঁও এর ফকির, পীর মোহম্মদ অর্থাৎ 'বড়ে বাবা'ও বাবার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বাবা ওকে পাঁঠাটা কেটে বলি দিতে বলেন। শ্রী সাইবাবা 'বড়ে বাবা'কে খুব সম্মান করতেন। তাই উনি সব সময় বাবার ডানদিকে বসতেন। সবার আগে বড়ে বাবা ছিলিম খেতেন, তারপর বাবাকে

দিতেন। তার পর ভক্তরা পেত। দুপুরে যখন খাবার বাড়া হতো, তখন বাবা 'বড়ে বাবা'কে আদর করে, নিজের ডান দিকে বসাতেন এবং তখন বাকী সবাই খেতে শুরু করত। বাবার কাছে যতটা দক্ষিণা একত্রিত হতো তার থেকে, তিনি রোজ ৫০ টাকা 'বড়ে বাবা'-কে দিতেন। যখন 'বড়ে বাবা' ফিরে যেতেন, বাবা ওঁকে খানিকটা দূর এগিয়ে দিয়ে আসতেন। এত সম্মান পাওয়া সত্ত্বেও, যখন ওঁকে বাবা পাঁঠা কাটতে বলেন, তখন 'বড়ে বাবা' সোজাসুজি মানা করে দেন এবং স্পষ্ট শব্দে বলেন যে 'বলি দেওয়া ব্যর্থই হবে।' তখন বাবা শামাকে বলি দিতে বলেন। উনি রাধাকৃষ্ণমাঈয়ের বাড়ী থেকে একটা ছুরি নিয়ে আসেন এবং সেটা বাবার সামনে রেখে দেন। রাধাকৃষ্ণমাঈ কারণটা জানতে পেরে, ছুরিটা ফেরত চেয়ে পাঠান। শামা তখন আরেকটা ছুরির খোঁজে বেরোন ও অনেকক্ষণ পর্যন্ত মস্‌জিদে ফেরেন না। এবার কাকাসাহেব দীক্ষিতের পালা। এই সোনা তো খাঁটি ছিল কিন্তু তার পরখ হওয়া দরকার। বাবা ওঁকে ছুরি এনে পাঁঠাটা কাটতে বলেন। কাকাসাহেব সাঠে 'ওয়াড়া' থেকে একটা ছুরি নিয়ে আসেন এবং বাবার আজ্ঞা পাওয়ামাত্র বলি দিতে প্রস্তুত হন। পবিত্র ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম হওয়ায়, কাকাসাহেব জীবনে বলি দেওয়া জানতেন না। যদিও হিংসাবৃত্তি নিন্দনীয়, তবুও উনি পাঁঠা কাটতে প্রস্তুত ছিলেন। সবাই আশ্চর্য্য হয় যে, 'বড়ে বাবা' মুসলমান হয়েও বলি দিতে রাজী হলেন না আর ইনি সনাতন ব্রাহ্মণ হয়ে বলি দিতে রাজী হয়ে গেলেন। এদিকে কাকাসাহেব ধুতি উপরে করে, ছুরি নিয়ে, হাত উপরে উঠিয়ে, বাবার অন্তিম আদেশের প্রতীক্ষা করছিলেন। বাবা বলেন- "আর কি ভাবছ? ঠিক আছে, মারো।" কাকাসাহেব যেই কোপটা বসাতে যাবেন, এমন সময় বাবা বললেন- "দাঁড়াও, তুমি কত বাজে লোক! ব্রাহ্মণ হয়ে পাঁঠা বলি দিচ্ছ?" কাকাসাহেব ছুরিটা নীচে রেখে বাবাকে বলেন- "আপনার আদেশই আমাদের জন্য সর্বস্ব,

আমরা অন্য বিধান কি জানি? আমরা তো সর্বদা আপনার কথাই স্মরণ করি এবং দিন-রাত আপনারই আজ্ঞা পালন করি। এই বিচার করে কি লাভ যে, পাঁঠা মারা উচিত না অনুচিত। আর নাই আমরা তার কারণ জানতে ইচ্ছুক। গুরুর আজ্ঞা নিঃসংকোচে ও অক্ষরে অক্ষরে পালন করাই আমাদের কর্তব্য ও ধর্ম।" তখন বাবা কাকাসাহেবকে বলেন- "আমি নিজেই বলি দেব।" তখন এই স্থির হয় যে, একটু দূরে (যেখানে অনেকগুলি ফকির বসেছিল) গিয়ে বলি দেওয়া হবে। সেখানে নিয়ে যাওয়ার সময় পথেই, পাঁঠাটা মারা যায়।

ভক্তদের শ্রেণীর বর্ণনা করে হেমাডপন্ত এই অধ্যায়টি শেষ করেছেন। ভক্ত তিন ধরনের হয় - ১) উত্তম ২) মধ্যম ৩) সাধারণ। প্রথম শ্রেণীর ভক্ত তাঁরা, যাঁরা নিজের গুরুর ইচ্ছে আগে থেকেই বুঝে, সেটা কর্তব্য জেনে আদেশের অপেক্ষা না করে, সেবা করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভক্ত তাঁরা, যাঁরা গুরুর আজ্ঞা পেয়েই তক্ষুনি সেটি পালন করেন। তৃতীয় শ্রেণীর ভক্ত তাঁরা, যাঁরা গুরুর আদেশ পালন করতে সব সময় বিলম্ব করেন এবং পদে-পদে ভুল করেন। ভক্তরা যদি নিজেদের বুদ্ধি জাগ্রত করে ও ধৈর্য্য ধারণ করে দৃঢ় বিশ্বাস রাখেন, তাহলে তাদের আধ্যাত্মিক লক্ষ্য নিঃসন্দেহে কাছে এসে যায়। শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণ, হঠযোগ বা অন্য কঠিন সাধনার কোন দরকার হয় না। শিষ্যর মধ্যে যখন ঐ গুণগুলির বিকাশ হয় এবং পরবর্ত্তী উপদেশের জন্য ভূমিকা তৈরী হয়ে যায়, তখন গুরু স্বয়ং প্রকট হয়ে তাকে পূর্ণতার (আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধতা) দিকে নিয়ে যান। পরের অধ্যায়ে বাবার মনোরঞ্জক হাসি-ঠাট্টার বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

অধ্যায় - ২৪

শ্রী বাবার হাস্যবিনোদ, ভাজা ছোলার লীলা (হেমাডপন্ত), সুদামার কাহিনী, আম্মা চিঞ্চনীকর এবং মৌসীবাঈ'-য়ের গল্প, বাবার ভক্তপরায়ণতা।

প্রারম্ভ ঃ-

পরবর্তী অধ্যায়ে অমুক-অমুক বিষয় বর্ণনা করা হবে, এরকম বলাটাও এক রকমের অহংকার। **যতক্ষন অহংকার গুরুচরণে অর্পণ না করা হয়, ততক্ষন সত্যস্বরূপের প্রাপ্তি সম্ভব নয়। নিরভিমানী হলে, সফলতা নিশ্চিত রূপে প্রাপ্ত করতে পারব।**

শ্রী সাইবাবার প্রতি ভক্তির পথে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক দুই পদার্থরই লাভ হয় এবং আমরা নিজেদের মূল প্রকৃতিতে স্থিরতা লাভ করে শান্তি ও সুখের অধিকারী হয়ে যাই। তাই নিজেদের মঙ্গল যারা সাধন করতে চান, শ্রী সাইবাবার লীলা শ্রবণ করে, সেগুলি মনন করাটাই তাদের একমাত্র কর্তব্য। যদি এভাবে প্রচেষ্টা করা হয়, তাহলে তাদের জীবনে লক্ষ্য ও পরমানন্দ সহজেই প্রাপ্ত হবে।

প্রায় সবাই-ই হাসি-ঠাট্টা ভালবাসে, কিন্তু স্বয়ং হাসির পাত্র হতে কেউ চায় না। এই বিষয়ে বাবার রীতি বিচিত্রই ছিল। ভাবপূর্ণ হয়ে যখন তিনি কৌতুক করতেন, তখন খুবই মজার ও শিক্ষাপ্রদ হত। তাই ভক্তদের স্বয়ং ঠাট্টার পাত্র হতে হলে, তারা কোন আপত্তি করত না। শ্রী হেমাডপন্ত এই ধরনের নিজের একটি অভিজ্ঞতা পাঠকদের

শোনাচ্ছেন।

ভাজা ছোলার লীলা ঃ-

শিরডীতে প্রতি রবিবার বাজার বসত। আশেপাশের গ্রাম থেকে লোকেরা ওখানে এসে রাস্তার উপর দোকান লাগাত এবং জিনিষ বিক্রী করত। এমনিতেই দুপুর বেলা মস্‌জিদে লোকের অসম্ভব ভীড় হত। কিন্তু রবিবারের দিন এত বেশী ভিড় হত যে, প্রায় দম বন্ধ হয়ে যেত। এমনই এক রবিবারে শ্রী হেমাডপন্ত বাবার চরণ সেবা করছিলেন। শামা বাবার বাঁদিকে এবং ওয়ামন রাও বাবার ডান দিকে বসে ছিলেন। শ্রীমান বুটী এবং কাকাসাহেব দীক্ষিতও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তখন শামা হেসে আন্নাসাহেবকে বলেন, "দেখো তো, তোমার কোটের আস্তিনে মনে হচ্ছে কয়েকটা ছোলার দানা লেগে আছে" -এই বলে ওঁর আস্তিন স্পর্শ করতেই সেখানে কয়েকটা ছোলার দানা পেলেন।

হেমাডপন্ত নিজের বাঁ হাতটা ঝাড়তেই, ছোলার আরো কিছু দানা নীচে গড়িয়ে পড়ল। উপস্থিত লোকেরা সেগুলি উঠিয়ে নিলেন। ভক্তরা ঠাট্টার একটা সুযোগ পেয়ে গেলেন এবং সবাই আশ্চর্য্য হয়ে নানা রকমের অনুমান করতে শুরু করেন, কিন্তু এটা বুঝে উঠতে পারেন না যে ছোলার দানা গুলি ওখানে কি ভাবে আসলো এবং অতক্ষণ অবধি ওখানে কিভাবে আটকে ছিল। সকলেই রহস্য-উদ্ধারে ব্যস্ত, কিন্তু সন্তোষজনক উত্তর কারো কাছে ছিল না। তখন বাবা বলতে শুরু করেন- "এই ভদ্রলোকের (আন্নাসাহেবের) একান্তে খাওয়ার বদভ্যাস আছে। আজ হাটের দিন, ছোলা চিবুতে চিবুতে এসেছেন। ছোলার দানাগুলি তার প্রমাণ। তাই আশ্চর্য্য হওয়ার কি

আছে?" হেমাডপন্ত বলেন- "বাবা, আমার একলা খাওয়ার অভ্যাস একেবারেই নেই, তবে এই ধরনের দোষারোপ কেন করছেন? আমি এখনো শিরডীর হাট দেখিনি। আজকের দিনে তো ভুলেও বাজারে যাইনা, তাই ছোলা খাওয়ার কথাই ওঠে না। খাবার সময় যারা আমার কাছে থাকে, তাদের না দিয়ে আমি কখনো খাই না।" বাবা বললেন "তুমি ঠিক বলছো। যদি তোমার কাছে কেউ নাই থাকে, তাহলে তুমি বা আমি কি করতে পারি? আচ্ছা, বলো তো, খাওয়ার আগে, তোমার কখনো আমার কথা কি মনে পড়ে? আমি কি সর্বদা তোমার সঙ্গে নেই? তাই, তুমি কি আগে আমায় অন্ন অর্পণ করে তারপর সেটা গ্রহণ করো?"

শিক্ষা ঃ-

এই ঘটনাটির মাধ্যমে বাবা কি শিক্ষা প্রদান করছেন, সেই দিকে একটু দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। এর সারাংশ এই যে, **ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সাহায্যে কোন পদার্থের রসাস্বাদন করার আগে, বাবাকে স্মরণ করা উচিত। তাঁর স্মরণই অর্পণের বিধি। ইন্দ্রিয়গুলি বিষয় চিন্তন না করে থাকতে পারে না। তাই বস্তুগুলি উপভোগ করার আগে, ঈশ্বরার্পণ করে দিলে তাদের প্রতি আসক্তি সহজেই নষ্ট হয়ে যায়।** এই ভাবে সমস্ত ইচ্ছে, ক্রোধ ও তৃষ্ণা ইত্যাদি কু-প্রবৃত্তিগুলি ঈশ্বরার্পণ করে গুরুর দিকে চালিত করা উচিত। এটির যদি নিত্য অভ্যাস করো, তাহলে পরমেশ্বর কু-প্রবৃত্তিকে দমন করায় তোমার সহায়ক হবেন। বিষয়ের রসাস্বাদন করার আগে, সেখানে বাবার উপস্থিতির খেয়াল অবশ্যই রাখা উচিত। তখন বিষয় উপভোগ উপযুক্ত কিনা, এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে, আচরণে পরিবর্তণ আসবে।

এর ফলে গুরু প্রেমে বৃদ্ধি হয়ে শুদ্ধ জ্ঞান প্রাপ্ত হবে। যখন এই ধরনের জ্ঞানের বৃদ্ধি হয়, তখন দেহচেতনা নষ্ট হয়ে আমাদের বুদ্ধি চৈতন্যধনে লীন হয়ে যায়। বস্তুতঃ গুরু ও ঈশ্বরের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই এবং যে তাঁদের ভিন্ন মনে করে, তার ঈশ্বর দর্শন হওয়া দুর্লভ। তাই সমস্ত ভেদ বুদ্ধি ছেড়ে গুরু ও ঈশ্বরকে অভিন্ন মনে করা উচিত। এই ভাবে গুরু সেবা করলে, ঈশ্বরকৃপা নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হবে এবং তখন তিনি আমাদের চিত্ত শুদ্ধ করে, আত্মানুভূতি প্রদান করবেন। সারাংশ এই যে, **ঈশ্বর বা গুরুকে অর্পণ না করে, আমাদের কোন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়ের রসাস্বাদন করা উচিত নয়।** এইরূপ অভ্যাস করলে, ভক্তিতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হবে। তারপর শ্রী সাইয়ের মনোহর সগুণ মূর্তি সর্বদা আমাদের চোখের সামনে থাকবে। তখন ভক্তি, বৈরাগ্য এবং মোক্ষ আমাদের আয়ত্তে আসবে। ধ্যান প্রগাঢ় হলে, সাংসারিক অস্তিত্ব বিস্মৃত হয়ে যাবে এবং সাংসারিক বিষয়ের আকর্ষণ নিজে-নিজেই নষ্ট হয়ে, চিত্ত সুখ ও শান্তি অনুভব করবে।

সুদামার কাহিনী ঃ-

উপরোক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করতে-করতে, হেমাডপন্তের স্বাভাবিক ভাবেই সুদামার কাহিনী মনে পড়ে যায়, যেটি উপরে বর্ণিত মূলতত্ত্বটির পুষ্টি করে। শ্রীকৃষ্ণ নিজের বড় ভাই বলরাম ও এক সহপাঠী সুদামার সাথে সন্দীপনি ঋষির আশ্রমে বিদ্যাধ্যয়ন করতেন। একবার কৃষ্ণ ও বলরাম কাঠ আনবার জন্য বনে যান। ঋষি-পত্নী সুদামাকেও ঐ কাজের নিমিত্তে বনে পাঠান এবং তার হাতে তিনজনের জন্য কিছু ছোলাভাজাও দেন। বনের মধ্যে কৃষ্ণ সুদামাকে বলেন- "দাদা, আমায় একটু জল দাও, খুব তেষ্টা পাচ্ছে।" সুদামা জবাব দেন- "খালি

পেটে জল খেতে নেই, ক্ষতি হয়। তাই কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নাও।" সুদামা ভাজা ছোলার সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করেন না এবং কৃষ্ণকে তার ভাগও দেন না। কৃষ্ণ ক্লান্ত তো ছিলেনই, তাই সুদামার কোলে মাথা রাখতেই, ঘুমিয়ে পড়েন। তখন সুদামা সুযোগ পেয়ে ছোলা চিবুতে শুরু করেন। হঠাৎ কৃষ্ণ তাকে জিজ্ঞাসা করে বসেন- "দাদা, তুমি কি খাচ্ছো? এই আওয়াজ কিসের?" সুদামা উত্তর দেন- "খাওয়ার মত এখানে আছেটাই বা কি? আমি তো ঠান্ডায় কাঁপছি। তাই দাঁতে দাঁত লেগে শব্দ হচ্ছে। দেখ, আমি ঠিক করে বিষ্ণুসহস্রনামও উচ্চারণ করতে পারছি না।" এই কথা শুনে, অন্তর্যামী কৃষ্ণ বলেন- "দাদা, আমি এখুনি স্বপ্ন দেখলাম, একটি লোক অন্যের খাবার খেয়ে নিচ্ছে। ওকে যখন সেই বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়, তখন সে উত্তর দেয়- 'ছাইপাঁশ খাচ্ছি।' তখন প্রশ্নকর্তা বলেন- 'বেশ, তাই যেন হয় (এবমস্তু)।' দাদা এটা তো একটা স্বপ্ন মাত্র। আমি তো জানি যে, তুমি আমায় ছেড়ে অন্নর এক দানাও মুখে দাও না। স্বপ্নের ঘোরেই এমন প্রশ্ন করে ফেললাম।" কৃষ্ণের সর্বজ্ঞতার বিষয়ে যদি সুদামার কিঞ্চিৎমাত্র জ্ঞান থাকত, তাহলে উনি এই ধরনের আচরণ করতে পারতেন না। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যবন্ধু হওয়া সত্ত্বেও, সুদামা খানিকটা জীবন প্রচন্ড দারিদ্রতায় কাটান। কিন্তু শুধুমাত্র এক মুঠো চিঁড়ে, যেটা ওঁর স্ত্রী অনেক পরিশ্রম করে উপার্জন করেছিল, শ্রী কৃষ্ণকে দিতেই তিনি অতি প্রসন্ন হন এবং তার বদলে স্বর্ণনগরী প্রদান করেন। যারা অন্যদের না দিয়ে একান্তে খায়, তাদের এই কাহিনীটি সব সময় মনে রাখা উচিত। "শ্রুতি"তে এই শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে যে, **প্রথমে ঈশ্বরকে অর্পণ করে পরে তাঁর উচ্ছিষ্ট অন্ন গ্রহণ করা উচিত।** এই শিক্ষাই বাবা হাসি-ঠাট্টার ছলে দেন।

আন্না চিঞ্চনীকর এবং মৌসীবাঈ ঃ-

এবার শ্রী হেমাডপন্ত দ্বিতীয় হাস্যকর ঘটনাটি বর্ণনা করছেন। এই গল্পটি বাবার এক ভক্ত, দামোদর ঘনশ্যাম বাবরে, ওরফে আন্না চিঞ্চনীকরের। উনি ছিলেন- নির্ভীক, সরল এবং খানিকটা কঠোর স্বভাবের। উনি কাউকে পরোয়া করতেন না এবং সোজাসুজি কথা বলতেন। বৈষয়িক ব্যাপারে, সব নগদে কারবার করতেন। যদিও ব্যবহারিক দৃষ্টিতে, ওঁকে একটু রুক্ষ ও অসহিষ্ণু মনে হত, কিন্তু অন্তঃকরণে উনি নিষ্কপট ছিলেন। তাই বাবা ওঁকে বিশেষ ভালবাসতেন। ভক্তরা নিজের নিজের ইচ্ছানুসারে বাবার সেবা করতেন। একদিন দুপুরবেলা আন্না উপুড় হয়ে রেলিং-এর উপর রাখা বাবার বাঁ হাতটি মালিশ করছিলেন। অন্যদিকে, একজন বৃদ্ধা বিধবা মহিলা বাবার পেটে হাত বুলাচ্ছিলেন। নাম বেণুবাঈ কৌজলগী। বাবা ওঁকে 'মা' বলে ডাকতেন এবং অন্যান্য লোকেরা বলত 'মৌসীবাঈ'। মৌসীবাঈ ছিলেন শুদ্ধ চরিত্রা বয়স্কা মহিলা। তিনি সেসময় বাবার পেট এত জোরে মালিশ করছিলেন যে, বাবার পেট ও পিঠ প্রায় এক হয়ে যাওয়ার দশা। তার ফলে বাবা এপাশ ওপাশ নড়াচড়া করছিলেন। আন্না ওদিকে সেবায় ব্যস্ত। হাতের পরিচালন ক্রিয়ার ফলে মৌসীবাইয়ের মাথা উপর-নীচে হচ্ছিল। এভাবে যখন দুজনেই সেবায় জুটে ছিলেন, সেই সময় অনায়াসেই মৌসীবাঈয়ের মুখ আন্নার মুখের খুব কাছে এসে যায়। মৌসীবাঈ একটু বিনোদ করতে ভালবাসতেন, তাই একটু বিদ্রুপ করে বলেন, "এই আন্না খুব বদ। ও আমায় চুমু খেতে চায়। চুল পেকে গেছে কিন্তু আমায় চুমু খেতে লজ্জা হচ্ছে না।" এই কথা শুনে আন্না ভয়ঙ্কর রেগে ওঠেন ও বলেন, "কি? আমি বুড়ো ও বদ লোক? আমি কি বোকা? তুমি নিজেই দুষ্টুমি করে আমার

সঙ্গে ঝগড়া করতে চাইছ।" উপস্থিত সবাই এই বিবাদে আনন্দ উপভোগ করছিল। বাবা দুজনকেই স্নেহ করতেন। তাই তিনি কৌশলে এই বিবাদটা মিটিয়ে দেন। তিনি সস্নেহে বলেন, "আরে আন্না, মিছিমিছি কেন ঝগড়া করছ? আমি তো বুঝতেই পারছিনা যে মাকে চুমু খাওয়াতে দোষ কোথায়?" বাবার কথা শুনে দুজনেই শান্ত হন এবং উপস্থিত সবাই মন ভরে বাবার বিনোদ পদ্ধতির আনন্দ উপভোগ করে।

বাবার ভক্ত পরায়ণতা ঃ-

বাবা ভক্তদের তাদের ইচ্ছানুসারে তাঁর সেবা করতে দিতেন এবং এ বিষয় কোনরকম হস্তক্ষেপ তিনি সহ্য করতেন না। অন্য একদিন মৌসীবাঈ বাবার পেট খুব জোর দিয়ে মালিশ করছিলেন। তা দেখে ভক্তরা ব্যগ্র হয়ে মৌসীবাঈকে বলে- "একটু আস্তে টিপুন। এত জোরে চাপ দিলে নাড়ী-ভুঁড়ি ফেটে যাবে।" যেই না এই বলা, বাবা তক্ষুনি নিজের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান ও রাগে চোখ দুটি আগুণের মত লাল। কার সাহস যে কেউ কিছু বলে? তিনি দুটো হাত দিয়ে নিজের ডান্ডার এক দিকটা নাভির সঙ্গে লাগিয়ে এবং অন্য দিকটা মাটির উপর রেখে সেটা পেট দিয়ে চাপ দিতে শুরু করেন। দু-তিন ফুট লম্বা ডান্ডাটি, মনে হচ্ছিল, পেটে ঢুকে গিয়ে যে কোন মুহূর্তে পেট ফাটিয়ে দেবে। সকলে বিস্ময়ে এবং ভয়ে যেন বোবা হয়ে গিয়েছিল। ওরা তো মৌসীবাঈকে শুধু এতটাই ইঙ্গিত দিতে চাইছিল যে, একটু সহজ ভাবে সেবা করলে ভালো হয়। বাবাকে কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছে কারোই ছিল না। সদ্‌ভাবনা দ্বারা প্রেরিত হয়েই ওরা একথা বলে। তাতে যে এরকম দুর্গতি হবে, সেটা কে জানত?

কিন্তু বাবা নিজের কাজে এতটুকু হস্তক্ষেপ পছন্দ করতেন না। দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়া তাদের আর কিছু করার রইল না। কিছুক্ষণ পর বাবার রাগ শান্ত হয় এবং তিনি ডান্ডা ছেড়ে, নিজের আসনে গিয়ে বসেন। এই ঘটনার থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যে, **অন্যদের ব্যপারে কখনো হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।** প্রত্যেকের নিজের ইচ্ছা মতো বাবার সেবা করার অধিকার আছে। শুধু বাবাই সেই সেবার মূল্যাঙ্কন করতে সক্ষম।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

অধ্যায় - ২৫

১) দামু আন্না কাসার - আহমদনগরের তুলো ও ধানের ব্যবসা ২) আম্রলীলা, প্রার্থনা।

যিনি অকারণেই অন্যদের উপর দয়া করেন, সমস্ত প্রাণীদের জীবন ও আশ্রয়দাতা এবং যিনি পরমব্রহ্মের পূর্ণ অবতার-সেই মহান যোগীরাজের চরণে আমি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে, এবার এই অধ্যায় আরম্ভ করছি।

শ্রীসাইয়ের জয় হোক্। তিনি সন্ত চূড়ামণি, সমস্ত শুভ কার্য্যের উদ্‌গম স্থান, আমাদের আত্মারাম ও ভক্তদের আশ্রয়দাতা। আমরা শ্রীসাইনাথের চরণ বন্দনা করি, যিনি নিজের জীবনের অন্তিম লক্ষ্য প্রাপ্ত করে নিয়েছিলেন।

শ্রী সাইবাবা সর্বদাই করুণায় পরিপূর্ণ। আমাদের শুধু তাঁর চরণকমলে দৃঢ় ভক্তি অর্পণ করা উচিত। যখন ভক্তের বিশ্বাস দৃঢ় ও ভক্তি পরিপক্ক হয়, তখন তার মনোরথও শীঘ্রই পূরণ হয়ে যায়। হেমাডপন্তের যখন 'সাই চরিত্র' ও সাই লীলা রচনা করার তীব্র উৎকণ্ঠা হয়, তখন বাবা তক্ষুনি সেটা পূরণ করে দেন। ওঁকে স্মৃতি-পত্র ইত্যাদি একত্রিত করতে বলা হতেই, হেমাডপন্তের মধ্যে স্ফূর্তি, বুদ্ধি, শক্তি ও কাজ করার ক্ষমতা আপনা-আপনিই উদয় হয়। উনি নিজেই স্বীকার করে বলেছেন- "সম্পূর্ণ অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও, শ্রী সাইয়ের শুভাশীর্বাদেই এই কঠিন কাজটি পুরো করতে পেরেছি। তাই এই পবিত্র গ্রন্থ 'শ্রী সাই সৎচরিত্র' আপনারা পেয়েছেন।" এটি একটি নির্মল স্রোত বা চন্দ্রকান্তমণির ন্যায়, যার থেকে সর্বদা সাই-লীলারূপী

অমৃত ঝরছে, যাতে পাঠকগণ মন ভরে সেটা পান করতে পারেন। যখন ভক্ত পূর্ণ অন্তঃকরণ দিয়ে শ্রী সাইবাবাকে ভক্তি করতে শুরু করে, তখন বাবা তার সমস্ত কষ্ট এবং দুর্ভাগ্য দূর করে স্বয়ং তাকে রক্ষা করেন। আহমদনগরের শ্রী দামোদর সাঁওলরাম রাসনে কাসারের নীচের কাহিনী তারই প্রমাণ।

দামু আন্না ঃ-

পাঠকদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে, এই মহাশয়ের কথা ষষ্ঠ অধ্যায়ে শিরডীতে রাম নবমী উৎসবের প্রসঙ্গে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ইনি **১৮৯৬** সাল নাগাদ শিরডী আসেন। সে সময় রামনবমীর উৎসব সবে শুরু হয়েছিল। তবে থেকেই উনি একটি জরির সুন্দর ধ্বজা এই উপলক্ষে উপহার রূপে দিতেন এবং দরিদ্র-ভোজন করাতেন।

দামু আন্নার ব্যবসা ঃ-

১) তুলোর ব্যবসা -

দামু আন্নাকে বম্বের ওঁর এক বন্ধু লেখেন যে, আন্নার সাথে উনি তুলোর ব্যবসা (ভাগের কারবার) করতে চান, যাতে প্রায় দু'লক্ষ টাকা লাভ হওয়ার আশা আছে। **১৯৭৫** সালে শ্রী নরসিংহ স্বামীকে দেওয়া এক বক্তব্যে দামু আন্না জানান যে, বম্বের এক দালাল তুলোর এই ব্যবসার প্রস্তাব রাখে এবং পরে অংশীদারত্ব থেকে হাত ঝেড়ে ওঁর উপরই সব ভার দেওয়ার ফন্দিতে ছিল ('ভক্তদের অভিজ্ঞতা' ভাগ **১১** পৃষ্ঠ **৭৫** অনুসারে)। দালালটি লিখে ছিল যে, ব্যবসাটা খুবই ভালো এবং ক্ষতি হওয়ার কোন আশঙ্কা নেই- এমন সুবর্ণ

সুযোগ হাত থেকে যেতে দেওয়া উচিত নয়। দামু আন্নার মন দু দিকেই দুলতে লাগল। স্বয়ং কোন কিছু নির্ণয় করার সাহস তাঁর হচ্ছিল না। তাই বাবার ভক্ত হওয়ার দরুণ, সমস্ত বিবরণ দিয়ে শামাকে একটা চিঠি লিখে পাঠান, যাতে বাবাকে এ বিষয়ে পরামর্শ দিতে অনুরোধ করেন। চিঠিটি শামা পরের দিন পান এবং দুপুরে মস্‌জিদে বাবার সামনে রাখেন। শামার কাছে বাবা চিঠির বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। উত্তরে শামা বলেন- "আহমদনগরের দামু আন্না কাসার আপনার অনুমতি পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করেছেন।" বাবা জিজ্ঞাসা করেন- "ও এই চিঠিতে কি লিখছে? ওর পরিকল্পনাটা কি? আমার তো মনে হচ্ছে ও আকাশ ছুঁতে চাইছে। যা কিছু ও ভগবৎ কৃপায় পেয়েছে, তাতে ও সন্তুষ্ট নয়। আচ্ছা, চিঠিটা পড়ে শোনাও।" শামা বলেন- "আপনি এক্ষুনি যা-যা বললেন, সেটাই চিঠিতে লেখা আছে। হে দেব! আপনি এখানে শান্ত ও স্থির হয়ে বসে থাকেন আর ওদিকে ভক্তদের উদ্বিগ্ন করে তোলেন। ওরা যখন অশান্ত হয়ে ওঠে, তখন আপনি ওদের আকর্ষিত করে কাউকে প্রত্যক্ষরূপে, তো কাউকে পত্র দ্বারা, এখানে টেনে আনেন। আপনি যখন চিঠির তাৎপর্য্য জানেনই, তখন আমায় সেটা পড়তে চাপ দিচ্ছেন কেন?" বাবা তখন বলেন- "শামা তুমি চিঠিটা পড়ো তো। আমি তো যা-তা বলি। আমার কথা কে বিশ্বাস করে?" তখন শামা চিঠিটা পড়েন এবং বাবা সেটা মন দিয়ে শুনে, চিন্তিত হয়ে বলেন- "আমার মনে হচ্ছে যে, শেঠ (দামু আন্না) পাগল হয়ে গেছে। ওকে লিখে দাও যে, ওর বাড়ীতে কোন অভাব নেই। তাই অর্দ্ধেক রুটিতেই সন্তুষ্ট হয়ে, লাখের চক্কর থেকে ওঁর দূরে থাকা উচিত।" শামা উত্তর লিখে পাঠিয়ে দেন। বলা বাহুল্য, দামু আন্না খুবই উৎসুক হয়ে, লাখ টাকা কামানোর যে স্বপ্ন দেখছিলেন সেটা ভেঙ্গে ধূলিসাৎ হল। ওঁর তখন

একবার এও মনে হয় যে, বাবার কাছে পরামর্শ চেয়ে উনি ভুল করলেন। শামা চিঠিতে ইঙ্গিত করেছিলেন যে- "দেখা ও শোনাতে তফাৎ আছে। তাই ভালো হয়, যদি তুমি নিজেই শিরডী এসে বাবার সঙ্গে দেখা করো।" তাই ব্যক্তিগত ভাবে বাবার সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য উনি শিরডী আসেন। বাবার দর্শন করে তাঁর চরণ বন্দনা করেন। কিন্তু বাবার সামনে ব্যবসার কথা তুলতে সাহস হচ্ছিল না। উনি মনে-মনে স্থির করেন- "যদি বাবা কৃপা করেন, তাহলে লাভের থেকে খানিকটা অংশ বাবাকে অর্পণ করব।" যদিও এই কথাটি দামু আন্না বড়ই গোপনে নিজের মনেই রেখেছিলেন, তবুও ত্রিকালদর্শী বাবার কাছে কিছু লুকোন থাকতে পারে কি? বাচ্চা তো মিষ্টি চায়, কিন্তু মা ওকে তেঁতো ওষুধ দেন, কারণ মিষ্টি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে। তাই সন্তানের কল্যাণের জন্য, মা তাকে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে তেঁতো ওষুধই খাইয়ে দেন। বাবাও এক মমতাময়ী মায়ের মতন। তিনি নিজের ভক্তের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত জানতেন। তাই তিনি দামু আন্নার মনের কথা বুঝে বলেন, "বাপু, আমি নিজেকে এই বৈষয়িক ব্যাপারে জড়াতে চাই না।" বাবার অনিচ্ছা জেনে দামু আন্না এই পরিকল্পনাটি ত্যাগ করেন।

চ) শষ্যের ব্যবসা -

এরপর উনি গম, চাল ইত্যাদির ব্যবসা শুরু করার কথা ভাবেন। বাবা ওনার এই পরিকল্পনার কথা জেনে ওঁকে বলেন- "তুমি টাকায় ৫ সের কিনে ৭ সের বিক্রী করবে।" তাই উনি এই ব্যবসার মৎলবও ছেড়ে দেন। কিছু সময় পর্যন্ত তো শস্যের দাম বাড়তে থাকে এবং মনে হয় যে বাবার ভবিষ্যবাণী বোধহয় ভুল হল। কিন্তু দু-এক মাস পরই সব জায়গায় পর্যাপ্ত বৃষ্টি হয়, ফলে শস্যের দাম হঠাৎ পড়ে

যায় এবং যারা শস্য সংগ্রহ করে রেখেছিল তাদের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। কিন্তু দামু আন্না এই বিপদ থেকে বেঁচে যান। বলা বাহুল্য যে, ঐ দালালটি অন্য একজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে তুলোর ব্যবসায় নামেন এবং তাতে তার যথেষ্ট ক্ষতি হয়। বাবা দুবার ওঁকে বিপদ থেকে বাঁচিয়ে নিলেন দেখে দামু আন্নার সাই চরণে বিশ্বাস দৃঢ় হয়। বাবার দেহরক্ষা পর্যন্ত এবং তারপরও, দামু আন্না একজন সত্যকার ভক্ত হিসাবে জীবন কাটিয়েছেন।

আম্রলীলা ঃ-

একবার গোয়ার এক মাম্‌লৎদার (নাম - রালে) শামার নামে প্রায় ৩০০ টা- আমের পার্শেল শিরডী পাঠান। পার্শেল খোলাতে প্রায় সব আমই ভালো বেরোয়। ভক্তদের সেগুলি বিতরণ করার দায়িত্ব শামাকে দেওয়া হয়। তার মধ্যে থেকে বাবা চারটে আম দামু আন্নার জন্য আলাদা করে বার করে রেখে দেন। দামু আন্নার তিনটি স্ত্রী ছিল। দামু আন্না কিন্তু নিজের বক্তব্যে জানিয়েছেন যে তাঁর দুটি স্ত্রীই ছিল। সন্তানহীন হওয়ার দরুণ অনেক জ্যোতিষীদের কাছে এই সমস্যার সমাধানের খোঁজে যান। নিজেও জ্যোতিষবিদ্যা চর্চা করে জানতে পারেন যে, ওঁর কুষ্ঠীতে এক পাপ গ্রহ থাকায় এই জীবনে ওঁর সন্তানসুখের কোন যোগ নেই। কিন্তু বাবার চরণে তো ওঁর অবিচল শ্রদ্ধা ছিল। পার্শেল পাওয়ার প্রায় দু-ঘন্টা পর, বাবার পূজো-অর্চনা করার জন্য উনি মস্‌জিদে আসেন। ওঁকে দেখে বাবা বলেন- "লোকেরা আমের জন্য ঘোরা-ঘুরি করছে, কিন্তু এগুলি তো দামুর। ওই খাবে আর মরবে।" এই শব্দগুলি শুনে দামু আন্নার হৃদয়ের উপর যেন বজ্রপাত হয়। কিন্তু মহালসা পতি (বাবার এক ভক্ত) দামু আন্নাকে বোঝান যে, এখানে মৃত্যুর অর্থ হল অহংকারের

বিনাশ এবং বাবার চরণে হলে, এইটি হবে পরম আশীর্বাদ। তখন উনি আম ক'টি খেতে রাজী হন। তাতে বাবা বলেন- "এগুলি তুমি খেও না, বরং তোমার ছোট বউকে খেতে বলো। এই আমের প্রভাবে, উনি চারটি পুত্র ও চারটি কন্যা জন্ম দেবেন।" এই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করে, দামু ঐ আম নিয়ে গিয়ে নিজের ছোট বৌকে দেন। শ্রী সাইবাবার লীলা ধন্য, যিনি ভাগ্যবিধান পাল্টে, সন্তান সুখ প্রদান করেন। বাবার কথা সত্য হয়, জ্যোতিষীদের নয়। মহান আশ্চর্য্যের কথা এই যে সমাধিস্থ হওয়ার পরও, তাঁর প্রভাব আগের মতনই আছে। বাবা বলেছিলেন- **"আমি চলে গেলেও, আমার অস্থি গুলি তোমাদের আশা ও বিশ্বাস জোগাবে। শুধু আমিই নয় আমার সমাধিও কথাবার্তা বলবে, চলবে ফিরবে এবং যারা অনন্যভাবে আমার শরণাগত হবে তাদের মনের আশা পূরণ করবে। আমি তোমাদের ছেড়ে দূরে চলে যাবো ভেবে নিরাশ হয়ো না। আমার অস্থিও ভক্তদের কল্যাণ চিন্তা করবে। হৃদয় দিয়ে আমায় বিশ্বাস করো, তবেই তোমাদের লাভ হবে।"**

প্রার্থনা ঃ-

একটি প্রার্থনা করে হেমাডপন্ত এই অধ্যায়টি সমাপ্ত করছেন।

"হে সাই সদ্‌গুরু। আপনার কাছে এই প্রার্থনা করছি যে, আমরা যেন কখনো আপনার অভয় চরণ না ভুলি। আপনার শ্রীচরণ কখনো যেন আমাদের দৃষ্টি থেকে আড়াল না হয়। আমরা এই জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পড়ে এই সংসারে অত্যধিক দুঃখী। এবার দয়া করে আমাদের এই চক্র থেকে শীঘ্র উদ্ধার করুন। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়-

পদার্থের দিকে আকৃষ্ট হয়। সেগুলিকে বাহ্য প্রবৃত্তি হতে রক্ষা করে, অন্তর্মুখী করে আমাদের আত্ম-দর্শনের যোগ্য করে তুলুন। আমাদের ইন্দ্রিয়ের বহির্মুখী প্রবৃত্তি এবং চঞ্চল মনের উপর অঙ্কুশ না থাকলে, আত্মোপলব্ধি হওয়া সম্ভব নয়। শেষ সময় আমাদের পুত্র-মিত্র কেউ কোন কাজে আসবে না। হে সাই! আমাদের তো একমাত্র আপনিই সহায় যিনি আমাদের মোক্ষ ও আনন্দ প্রদান করবেন। হে প্রভু! আমাদের যুক্তি-তর্কের বদ অভ্যাস এবং অন্য কু-প্রবৃত্তি গুলিকে নষ্ট করে দিন। আমাদের জিভ যেন সব সময় আপনার প্রার্থনাগানেরই স্বাদ গ্রহণ করতে পারে। হে প্রভু, আমাদের ভালো-মন্দের সব বিচার নষ্ট করে দিন। এমন কিছু করুন যাতে, আমাদের শরীর ও গৃহের প্রতি আসক্তি না থাকে। আমাদের অহংকার যেন নির্মূল হয়ে যায় ও আপনার নাম ছাড়া আর বাকী সব যেন বিস্মৃত হয়ে যায়। আমাদের মনের অশান্তি দূর করে, তাকে স্থির ও শান্ত করুন। হে সাই! আপনি যদি আমাদের হাত নিজের হাতে নিয়ে নেন তাহলে অজ্ঞানরূপী রাতের আবরণ শীঘ্রই সরে যাবে এবং আপনার জ্ঞানের আলোয় আমাদের জীবন আনন্দে ভরে উঠবে। এই যে আপনার লীলামৃত পান করার সৌভাগ্য আমরা পেয়েছি এবং যেটি আমাদের অখণ্ড নিদ্রা থেকে জাগ্রত করে দিয়েছে - এ আপনারই কৃপা ও আমাদের গত জন্মের শুভ কর্মের ফল।"

বিশেষ ঃ- এই প্রসঙ্গে শ্রী দামু আন্নার লিখিত বিবৃতি থেকে কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করা হচ্ছে- 'একবার যখন আমি অন্য লোকেদের সাথে বাবার শ্রীচরণে বসেছিলাম, আমার মনে দুটো প্রশ্ন ওঠে। বাবা দুটিরই জবাব দিয়েছিলেন।"

১) যে জনসমুদায় শ্রী সাইয়ের দর্শন করতে শিরডী আসে, তারা সবাই-ই কি লাভান্বিত হয়? এর উত্তরে বাবা বলেন- "ঐ আম গাছের

দিকে তাকিয়ে দেখো- কত মুকুল। যদি সব আমের মুকুলগুলিই ফল হত তাহলে, তো আমের গণনাই হতে পারবে না। কিন্তু তা হয় কি? কিছু যদি বা ফল হয়, তো তার মধ্যে থেকে কতকগুলি ঝড়ে নষ্ট হয়ে যায় এবং এই ভাবে অল্প কিছু ফলই গাছে পাকতে পারে।

২) দ্বিতীয় প্রশ্নটি আমার নিজের বিষয় ছিল। বাবার নির্বাণের পর আমি একেবারেই নিরাশ্রিত হয়ে যাবো, তখন আমার কি হবে? এর উত্তরে বাবা বলেন, **"যখন এবং যেখানে, তুমি আমায় স্মরণ করবে, আমাকে তোমার কাছেই পাবে।"** এই শপথ উনি **১৯১৮** সালের আগেও রেখেছেন, পরেও রেখেছেন এবং আজও রেখে যাচ্ছেন। এই কথা ক'টি বলেছিলেন **১৯১০-১১** সালে। সেই সময় আমার ভাই আমার থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং আমার বোন মারা যায়। আমার বাড়ীতে চুরি হয় ও পুলিশ বাড়ীতে আসা-যাওয়া করছিল। এই সব ঘটনাগুলি আমায় পাগল করে দিয়েছিল।"

"আমার বোনের মৃত্যু আমায় শোকাকুল করে তোলে। বাবার কাছে যেতে তিনি আমায় নিজের মধুর উপদেশ দিয়ে শান্ত করেন। আপ্পা কুলকর্ণীর বাড়ীতে 'পুরণপোলী' খেতে পাঠান এবং আমার কপালে চন্দন লাগিয়ে দেন।"

"গয়নার সিন্দুক থেকে আমার বৌয়ের 'মঙ্গলসূত্র', 'নথ' ইত্যাদি আমারই তিরিশ বছর পুরানো বন্ধু চুরি করে। আমি বাবার ছবির সামনে খুব কাঁদি। তার পরের দিনই, সেই লোকটি স্বয়ং গয়নার সিন্দুক আমায় ফিরিয়ে ক্ষমা চেয়ে যায়।"

।। শ্রী সাইনাথার্পণমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

অধ্যায় - ২৬

১) ভক্ত পন্ত ২) হরিশচন্দ্র পিত্‌লে ও ৩) গোপাল আম্বেদকরের কাহিনী

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে স্থূল, সূক্ষ্ম, চেতন ও জড় ইত্যাদি যা কিছু দেখা যায়, সে সব একই ব্রহ্ম এবং এই এক ও অদ্বিতীয় বস্তু ব্রহ্মকে আমরা বিভিন্ন নামে সম্বোধিত করি এবং ভিন্ন-ভিন্ন দৃষ্টি দিয়ে দেখি। আমরা যেমন অন্ধকারে পড়ে থাকা একটা দড়ি বা মালাকে ভুলবশতঃ সাপ বলে মনে করি, ঠিক সে ভাবেই সমস্ত পদার্থের কেবল বাহ্য রূপটিই দেখে, তাদের সত্য স্বরূপটি ভুলে যাই। একমাত্র সদ্‌গুরুই আমাদের দৃষ্টি থেকে মায়ার আবরণ সরিয়ে, বস্তুগুলির সত্য স্বরূপের যথার্থ দর্শন করাতে পারেন। তাই আসুন, আমরা শ্রী সদ্‌গুরু সাই মহারাজের উপাসনা করে, তাঁকে সত্যর দর্শন করাবার জন্য প্রার্থনা করি, যিনি ঈশ্বর ভিন্ন আর কেউ নন।

আন্তরিক পূজন ঃ-

শ্রী হেমাডপন্ত উপাসনার এক সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতি উল্লেখ করছেন। উনি বলেন যে, সদ্‌গুরুর পাদপ্রক্ষালনের নিমিত্তে আনন্দাশ্রুর উষ্ণ জল ব্যবহার করো। তাঁকে শুদ্ধ প্রেমরূপী চন্দনের প্রলেপ লাগিয়ে, দৃঢ় বিশ্বাস রূপী বস্ত্র পরাও। অষ্ট সাত্বিক ভাব রূপী আটটি পদ্মফুল ও একাগ্র চিত্তরূপী ফল তাঁকে অর্পণ করো। নিষ্ঠারূপী অভ্রচূর্ণ তাঁর কপালে লাগিয়ে, ভক্তির ধুতি পরিয়ে, নিজের মাথা তাঁর চরণতলে রাখো। এই ভাবে শ্রী সাইকে সমস্ত আভরণে ভূষিত করে, তাঁকে নিজের সর্বস্ব সমর্পণ করে দাও। উষ্ণতা দূর করার জন্য সর্বদা ভক্তির

চামর দোলাও। এই ভাবে সানন্দে পূজো করে প্রার্থনা করো-

"হে সাই! আমাদের প্রবৃত্তি অন্তর্মুখী করে দাও। সত্য এবং অসত্যের বিবেক দাও এবং সাংসারিক পদার্থ থেকে আসক্তি দূর করে আমাদের আত্মানুভূতি প্রদান করো। আমরা নিজেদের দেহ ও প্রাণ আপনার শ্রীচরণে অর্পণ করছি। হে সাই! আমাদের দৃষ্টি তুমি নিজের করে নাও, যাতে আমাদের আর সুখ-দুঃখ অনুভব না হয়। হে সাই! আমার শরীর ও মনকে তুমি নিজের ইচ্ছে অনুসারে চালাও ও আমার চঞ্চল মনকে তোমার পদতলে বিশ্রাম করার জায়গা দাও।"

এবার আমরা এই অধ্যায়ের কাহিনীগুলির দিকে আসি।

ভক্ত পন্ত ঃ-

একবার পন্ত নামে এক ভক্তের, যিনি অন্য একজন সদ্‌গুরুর শিষ্য ছিলেন, শিরডী আসার সৌভাগ্য হয়। ওঁর শিরডী আসার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু 'মানুষ ভাবে এক আর হয় আরেক'। হঠাৎ একদিন ট্রেনে, অনেক বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ওঁর দেখা হয়। ওঁরা সকলেই শিরডী যাচ্ছিলেন। পন্তকে ওঁদের সাথে শিরডী যেতে অনুরোধ করেন। পন্ত এই প্রস্তাব অস্বীকার করতে পারেন না। অন্যান্য সকলে বম্বেতে নামেন কিন্তু পন্ত বিরারে নেমে নিজের গুরুর কাছে শিরডী প্রস্থান করার অনুমতি নিয়ে এবং আবশ্যক খরচা আদির ব্যবস্থা করে, সবার সাথে শিরডী রওনা হন। প্রাতঃকালে শিরডী পৌঁছে বেলা ১১টা নাগাদ মস্‌জিদে যান। ওখানে পূজোর জন্য একত্রিত ভক্তদের দেখে সবাই খুব প্রসন্ন হন কিন্তু পন্ত হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। তখন সবাই ওঁকে সুস্থ করে তোলার যথাসাধ্য চেষ্টা করে। বাবার কৃপায় ও মাথায় জলের ছিটে দেওয়ায়, উনি সুস্থ হয়ে উঠে বসেন,

যেন কেউ ঘুম থেকে উঠে বসেছে। উনি অন্য গুরুর শিষ্য, একথা জানার পর ত্রৈকালজ্ঞ বাবা ওঁকে অভয় দান করে, ওঁর গুরুর প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় করতে বলেন- "যাই ঘটুক না কেন, নিজের স্তম্ভকে দৃঢ় ভাবে ধরে রেখো। সর্বদা একনিষ্ঠ হয়ে গুরুতেই অবিচলিত হয়ে থাকো।" পন্ত তক্ষুনি এই শব্দগুলির অর্থ বুঝে যান এবং ওঁর নিজের সদ্‌গুরুর কথা মনে পড়ে। বাবার এই করুণার কথা ওঁর জীবনভোর মনে থাকে।

শ্রী হরিশচন্দ্র পিত্‌লে ঃ-

হরিশচন্দ্র পিত্‌লে বম্বেতে থাকতেন। ওঁর ছেলে মৃগী রোগে ভুগছিল। অনেক রকমের দেশী ও বিদেশী চিকিৎসা করিয়েও কোন লাভ হয় না। এবার শুধু একটা উপায়ই বাকী ছিল - কোন মহাপুরুষের চরণের আশ্রয় নেওয়া। ১৫ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শ্রী দাসগণুর সুমধুর কীর্তনের মাধ্যমে, শ্রী সাইবাবার কীর্তি বম্বেতে ভালই ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯১০ সালে পিত্‌লে বাবার কীর্তন শোনেন ও উনি জানতে পারেন যে, শ্রী সাইবাবার করস্পর্শ ও দৃষ্টি দ্বারাই, অসাধ্য রোগ সমূলে নষ্ট হয়ে যায়। তখন ওঁর মনেও শ্রী সাইবাবার দর্শনের তীব্র ইচ্ছে জাগে। যাত্রার ব্যবস্থা করে, উপহার দেওয়ার জন্য ফলের ঝুড়ি হাতে করে বৌ ও বাচ্চাদের নিয়ে উনি শিরডী আসেন। মস্‌জিদে পৌঁছে চরণ বন্দনা করে, নিজের রোগী পুত্রকে বাবার চরণতলে রাখলেন। বাবার দৃষ্টি ওর উপর পড়তেই ওর মধ্যে এক বিচিত্র পরিবর্তন ঘটে। ছেলেটির চোখ দুটি ঘুরতে লাগল। ওর মুখ থেকে গ্যাঁজলা বেরোতে লাগলো ও শরীর ঘামে ভিজে গেল। মনে হচ্ছিল যেন, এবার প্রাণটাই বেরিয়ে যাবে। ওর বাবা-মা অত্যন্ত নিরাশ হয়ে পড়েন। ছেলেটি মাঝে-মাঝে অজ্ঞান

তো হত কিন্তু এবার যেন বেশীক্ষনের জন্য মূর্চ্ছা গেল। মায়ের চোখ থেকে ঝর-ঝর করে জল পড়ছিল। দুঃখে আর্তনাদ করে বলতে লাগলেন- "আমি এমন অবস্থায় পড়েছি যেন কেউ চোরের ভয়ে যে বাড়ীতে প্রবেশ করল সেই বাড়ীটাই তার উপর ভেঙ্গে পড়ল; যেন কোন গরু বাঘের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে কসাই এর হাতে পড়ল; রৌদ্রদগ্ধ পথিক শীতল ছায়ার আশায় গাছতলায় দাঁড়ালে সেই গাছই তার মাথায় পড়ল।" তখন বাবা ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন- "এরকম বিলাপ কোর না। ধৈর্য্য ধরো। ছেলেকে ঘরে নিয়ে যাও। আধ ঘন্টার মধ্যেই এর জ্ঞান ফিরে আসবে।" বাবার আদেশ ওঁরা তৎক্ষণাত্ পালন করেন। বাবার আশ্বাসই সত্যি হল। ছেলেটি সুস্থ হয়ে ওঠে। পিত্‌লে পরিবার ও অন্যান্য সবাই অত্যন্ত আনন্দিত হন। ওঁদের সমস্ত সংশয় দূর হয়ে গিয়েছিল। শ্রী পিত্‌লে সস্ত্রীক বাবার দর্শন করতে আসেন এবং অতি বিনম্র হয়ে শ্রদ্ধাপূর্বক বাবার চরণ বন্দনা করেন। বাবাকে মনে-মনে অসংখ্য ধন্যবাদ জানান। তখন বাবা হেসে জিজ্ঞাসা করেন- "তোমাদের সমস্ত চিন্তা-ভাবনা, সংশয় কেটে গেছে তো? যাঁদের ধৈর্য্য ও বিশ্বাস আছে, তাঁদের শ্রীহরি রক্ষা করেন।" শ্রী পিত্‌লে ছিলেন অবস্থাপন্ন লোক। তাই উনি ঢালাওভাবে মিষ্টি বিতরণ করেন এবং চমৎকার ফল ও পান বাবাকে অর্পণ করেন। শ্রীমতি পিত্‌লে সাত্বিক প্রকৃতির মহিলা ছিলেন। ওঁর চোখ থেকে কৃতজ্ঞতা ও আনন্দের অশ্রুধারা বইছিল। ওঁর মৃদু ও সরল স্বভাব দেখে বাবা প্রসন্ন হন। ঈশ্বরের ন্যায় সন্তরাও ভক্তদের অধীন। যারা তাঁর শরণাগত হয়ে অনন্য ভাবে তাঁরই পূজো করে, তাদের রক্ষা সন্তগণ নিশ্চয়ই করেন। শিরডীতে কিছুদিন সুখে-শান্তিতে থেকে, পিত্‌লে পরিবার প্রস্থান করার অনুমতি নেওয়ার জন্য বাবার কাছে মস্‌জিদে যান। বাবা ওদের 'উদী' দিয়ে আশীর্বাদ করে, শ্রী পিতলেকে

কাছে ডেকে বলেন, "বাপু, এর আগে আমি তোমায় দু'টাকা দিয়ে ছিলাম, এবার আমি তোমায় তিন টাকা দিচ্ছি। নিজের পূজোর জায়গায় রেখে, রোজ এই টাকাগুলির পূজো করো। তাতে তোমার মঙ্গল হবে।" শ্রী পিত্‌লে সেগুলি প্রসাদ রূপে গ্রহণ করেন। বাবাকে পুনঃ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে আশিসের জন্য প্রার্থনা করেন। হঠাৎ ওঁর মনে হল, উনি এই প্রথম শিরডীতে এসেছেন, তাহলে বাবার 'দু'টাকা আগে দিয়েছি' বলার অর্থ কি?

উনি এই রহস্যের সমাধাণ আশা করছিলেন, কিন্তু বাবা চুপ করেই বসে রইলেন। বম্বে পৌঁছে, উনি নিজের বুড়ী মাকে শিরডী যাত্রার সমস্ত বৃত্তান্ত শোনান এবং ঐ দু'টাকার কথাও বলেন। মাও প্রথমে ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেন না। কিন্তু অনেক চিন্তা করার পর, একটা পুরোন ঘটনা মনে পড়ে। ওঁর মা বলেন- "তুমি তোমার ছেলেকে নিয়ে যেমন শ্রী সাইবাবার দর্শন করতে গিয়েছিলে, তোমাকে নিয়ে তোমার বাবা তেমনি অনেক বছর আগে আক্কালকোট মহারাজের দর্শনে গিয়েছিলেন। মহারাজ পূর্ণ সিদ্ধ, যোগী, ত্রিকালজ্ঞ ও বড়ই উদার হৃদয়ের মহাপুরুষ ছিলেন। তোমার বাবাও ওঁর পরম ভক্ত ছিলেন, তাই ওর পূজো স্বীকৃত হয়। সেই সময় মহারাজ ওঁকে দু'টো টাকা বেদীতে রেখে পূজো করার জন্য দিয়েছিলেন। উনি আজীবন সেই ভাবে পূজো করে যান। ওঁর মৃত্যুর পর, সেই টাকাগুলির যথাবিধি পূজো হতে পারে না এবং টাকা দু'টি হারিয়ে যায়। কিছুদিন পর আমি সেগুলির কথা একেবারেই ভুলে যাই। তোমার খুব সৌভাগ্য যে, শ্রী আক্কালকোট মহারাজ সাই রূপে তোমায় তোমার কর্তব্য ও পূজোর কথা স্মরণ করিয়ে তোমায় সব বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। এবার ভবিষ্যতে সজাগ থেকে, সমস্ত

সংশয়, চিন্তা ভাবনা ছেড়ে নিজের পূর্বপুরুষদের স্মরণ করে, রীতি ইত্যাদি অনুসরণ করে, সদাচারী হও। নিজের কুলদেবতা ও এই টাকাগুলির পূজো করে, তাঁর যথার্থ স্বরূপটি বুঝে, সন্তদের আশীর্বাদ গ্রহণ করে, আত্মসন্তোষ পাও। শ্রী সাই সমর্থ দয়া করে তোমার মনে ভক্তির বীজ রোপন করেছেন। তোমার কর্তব্য হ'ল তার বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হওয়া। মায়ের কথা শুনে, শ্রী পিত্‌লে অত্যন্ত খুশী হন। বাবার সর্বকালজ্ঞতার পরিচয় উনি পেয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁর শ্রী দর্শনের মাহাত্ম্য বুঝতে পারেন। এরপর থেকে, উনি নিজের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে, বেশী সাবধান হলেন।

শ্রী আম্বেডকর ঃ-

পুণের শ্রী গোপাল নারায়ণ আম্বেডকর বাবার একজন পরম ভক্ত ছিলেন। ইনি ঠানে জেলার ও জওহর স্টেটের আবগারী (মদ্য প্রস্তুতকারী) বিভাগে দশ বছর ধরে কাজ করেন। সেখানে থেকে অবসর গ্রহণ করার পর, উনি অন্য চাকরী খোঁজেন কিন্তু সফল হন না। দুভার্গ্য ওঁকে চারিদিক দিয়ে ঘিরে নেয় এবং ওঁর আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়। এই ভাবে উনি সাত বছর কাটান। উনি প্রত্যেক বছর শিরডী যেতেন এবং নিজের দুঃখের কাহিনী বাবাকে শোনাতেন। ১৯১৬ সালে ওঁর দুরবস্থা যখন চরমে দাঁড়ায়, তখন উনি শিরডী গিয়ে আত্মহত্যা করবেন স্থির করেন। এই ভেবে উনি নিজের স্ত্রীর সাথে শিরডী আসেন এবং সেখানে দু মাস থাকেন। একদিন রাতে দীক্ষিত 'ওয়াড়া'র সামনে গরুর গাড়ীতে বসে বসে উনি কূয়ায় ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করবেন স্থির করেন এবং এদিকে বাবা ওঁকে রক্ষা করার ব্যবস্থাটা ঠিক করে রাখেন। কাছের এক ভোজনালয়ের মালিক, শ্রী সগুণমেরু নায়ক সেই সময় বাইরে এসে আম্বেডকরকে জিজ্ঞাসা

করেন -

"আপনি কখনো শ্রী আক্কালকোট মহারাজের জীবনী পড়েছেন?" আম্বেডকর তখন সগুণের কাছ থেকে বইটা নিয়ে পড়তে শুরু করেন। বইটা পড়তে-পড়তে একটি বিচিত্র ঘটনায় পৌঁছে উনি হতবাক্ হয়ে যান - আক্কালকোট মহারাজের জীবিতকালে একজন লোক এক অসাধ্য রোগে ভুগছিল। যখন কোন ভাবেই আর কষ্ট সহ্য করতে পারা সম্ভব হচ্ছিল না, তখন একেবারে নিরাশ হয়ে, সে কূয়োয় লাফিয়ে পড়ে। তক্ষুনি মহারাজ সেখানে পৌঁছে, স্বয়ং হাত বাড়িয়ে তাকে টেনে তোলেন। তিনি ওকে বোঝান যে, **"নিজের শুভ-অশুভ কর্মের ফল ভোগ করতেই হয়। ভোগ সম্পূর্ণ না হলে, আবার দেহধারণ করতে হয়। তাই আত্মহত্যা না করে, কিছু কাল সেগুলি সহ্য করে পূর্ব জন্মের কর্মফলের ভোগ জন্মের মতো শেষ করে দিয়ে যাও।"** এই রকম সময়োচিত এবং উপযুক্ত ঘটনা পড়ে আম্বেডকর খুবই অবাক হন।

গল্পের মাধ্যমে বাবার নির্দেশ না পেলে, এতক্ষণে ওঁর জীবন শেষ হয়ে যেতো। বাবার সর্বব্যাপকতা ও করুণার পরিচয় পেয়ে, ওঁর বিশ্বাস সুগভীর হল। ওঁর পিতা শ্রী আক্কালকোট মহারাজের শিষ্য ছিলেন এবং তাই বাবা চাইতেন যে, উনি ওঁর পিতারই পদচিহ্ন অনুসরণ করুন। বাবা ওকে আশীর্বাদ দেন ও তার ভাগ্য উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। উনি জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, অনেক উন্নতি করেন। অনেক ধন উপার্জন করে, শেষজীবন সুখে-সাচ্ছন্দ্যে কাটান।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

অধ্যায় - ২৭

বিষ্ণুসহস্র নাম প্রদান করে অনুগৃহীত করা, গীতা রহস্য, দাদাসাহেব খাপার্ডে।

এই অধ্যায়ে শ্রী সাইবাবা ধার্মিক গ্রন্থগুলিকে করস্পর্শ করে নিজের ভক্তদের পরায়ণের জন্য দিয়ে কি ভাবে তাদের অনুগৃহীত করতেন এবং অন্যান্য কিছু ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রারম্ভ ঃ-

লোকে এটা বিশ্বাস করে যে, সমুদ্রে স্নান করলে সমস্ত তীর্থ এবং পবিত্র নদীতে স্নান করার পুণ্য লাভ হয়। ঠিক সেরকমই সদ্‌গুরুর চরণের আশ্রয় নিলে, তিনটি শক্তি (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর) এবং পরমব্রহ্মকে প্রণাম করার মঙ্গলজনক ফল সহজেই পাওয়া যায়। শ্রী সচ্চিদানন্দ সাই মহারাজের জয় হোক্। তিনি তো ভক্তদের জন্য কল্পতরু, দয়ার সাগর ও আত্মোপলব্ধির দাতা। হে সাই! তুমি নিজের কাহিনী শ্রবণ করিয়ে, তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা জাগাও। যেমন স্বাতী নক্ষত্রের কেবল এক বিন্দু বৃষ্টির জল পান করেই চাতক পাখী প্রসন্ন হয়ে যায়, সেই রকমই নিজের কথার সারসিন্ধুর একটি জল কণার সহস্রাংশ দিয়ে দাও, যার দ্বারা পাঠকগণ ও শ্রোতাদের হৃদয় তৃপ্ত হয়ে আনন্দে ভরে উঠুক। শরীর হতে স্বেদ প্রবাহিত হোক, জলে চোখ ভরে যাক, প্রাণ স্থির হয়ে চিত্ত একাগ্র হয়ে যাক এবং ক্ষণে-ক্ষণে যেন দেহে রোমাঞ্চ জেগে ওঠে- এরকম সাত্বিক ভাব সবার মধ্যে জাগ্রত করে দাও। পারস্পরিক বৈমনস্য ও জাতপাতের প্রভেদ নষ্ট করে দাও। তারা যেন তোমার ভক্তিতে ফুঁপিয়ে কাঁদে,

ব্যাকুল হয়ে ওঠে এবং তাদের শরীরে কম্পন দেখা দেয়। যদি এইগুলি উৎপন্ন হওয়া শুরু হয়, তাহলে সেগুলি গুরুর কৃপার লক্ষণই বোঝা উচিত। এই ভাবগুলি অন্তঃকরণে উদয় হতে দেখে, গুরু অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে, আপনাদের আত্মানুভূতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। মায়া থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র সহজ উপায় হল, অনন্য ভাবে কেবল শ্রী সাইবাবার শরণে যাওয়া। বেদ-বেদান্তও মায়ারূপী সাগর পার করাতে পারে না। এই কাজটি তো কেবল সদ্‌গুরুর দ্বারাই সম্ভব। সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে ঈশ্বর দর্শন করার যোগ্য করে তোলার ক্ষমতা, শুধু তাঁরই আছে।

স্পর্শপূত গ্রন্থ প্রদান ঃ-

গত অধ্যায়ে বাবার উপদেশ দেওয়ার বিচিত্র পদ্ধতির পরিচয় আমরা পেয়েছি। এই অধ্যায়ে, শুধু একটা উদাহরণই উল্লেখ করা হবে। ভক্তরা যে গ্রন্থ বিশেষটি অধ্যয়ন করতে চাইতেন, সেটি বাবার করকমলে অর্পণ করে দিতেন। বাবা যদি সেটি নিজের শুভ হাত দিয়ে স্পর্শ করে ফিরিয়ে দিতেন, তাহলে ওরা সেটি আশীর্বাদ হিসাবে স্বীকার করে নিতো। তাদের বিশ্বাস যে, যদি সেই গ্রন্থটি নিত্য পাঠ করা হয় তাহলে বাবা সর্বদা ওদের সাথেই থাকবেন। একবার কাকা মহাজনী শ্রীএকনাথী ভাগবৎ নিয়ে শিরডী আসেন। শামা বইটি নিয়ে মস্‌জিদে গেলেন পড়ার জন্য। পরে বাবা সেটি স্পর্শ করে কয়েকটি পাতা উল্টিয়ে, শামাকে বইটি ফেরত দিয়ে তাঁর কাছেই রাখতে বলেন। তখন শামা বাবাকে জানান- "এটি তো কাকাসাহেবের এবং ওঁকে ফিরিয়ে দিতে হবে।" বাবা বললেন, "না, না, এই বইটি আমি তোমাকে দিলাম। তুমি এটা সাবধানে নিজের কাছে রাখো। তোমার

খুব কাজে লাগবে।" কিছুদিন পর কাকামহাজনী দ্বিতীয়বার শ্রী একনাথী ভাগবৎ এনে, বাবার করকমলে অর্পণ করেন। বাবা প্রসাদ স্বরূপ ফিরিয়ে, ওঁকেও সেটি সাবধানে সামলে রাখার আজ্ঞা দেন। তার সাথে-সাথে এও আশ্বাসন দেন, "এটি তোমায় চরম স্থিতিতে পৌঁছতে সাহায্য করবে।" কাকা বাবাকে প্রণাম করে গ্রন্থটি গ্রহণ করেন।

শামা ও বিষ্ণুসহস্র নাম ঃ-

শামা বাবার অতি অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন। তাই বাবার ওঁকে এক বিচিত্র উপায়ে 'বিষ্ণু সহস্র নাম' প্রসাদ রূপে দিতে ইচ্ছে হল। সেই সময় এক রামদাসী শিরডীতে এসে কিছুদিন ছিল। সে রোজ ভোরবেলা উঠে, হাত-মুখ ধোওয়ার পর স্নান করে গেরুয়া কাপড় পরে, শরীরে উদী মেখে বিষ্ণু সহস্র নাম জপ করত। তারপর করত অন্যান্য ধার্মিক গ্রন্থের পাঠ। বাবা শামাকে দিয়েও বিষ্ণু সহস্র নাম পাঠ শুরু করাতে চাইতেন। এই সূত্রে উনি রামদাসীকে নিজের কাছে ডেকে বলেন, আমার পেটে খুব ব্যথা হচ্ছে। সোনামুখী পাতার রস না খেলে, আমার ব্যথা দূর হবে না।" রামদাসী তক্ষুনি পাঠ ছেড়ে বাজারের দিকে ছুটল। বাবা তখন নিজের আসন থেকে উঠে, রামদাসীর আসনের কাছে গিয়ে 'বিষ্ণু সহস্র নাম' বইটি উঠিয়ে আবার নিজের আসনে ফিরে আসেন। শামার দিকে তাকিয়ে বলেন- "ওহে শামা, এই বইটি খুবই দামী ও লাভদায়ক। তাই আমি তোমায় এটি দিচ্ছি, পড়ে দেখো। একবার আমি খুব বেশী অসুস্থ হয়ে পড়ি। বুক ধড়ফড় করত- জীবন সংশয় হয়েছিল। সেই সময় আমি এই সদ্‌গ্রন্থটি নিজের বুকের উপর রাখি। কি যে সুখ পেয়েছিলাম! সেই সময়

আমার মনে হয়েছিল যেন স্বয়ং আল্লাহ পৃথিবীতে অবতারিত হয়ে আমায় রক্ষা করলেন। তাই তোমায়ও দিচ্ছি। ধীরে-ধীরে, একটু-একটু করে, দিনে অন্ততঃ একটা শ্লোক অবশ্যই পড়ো। তোমার খুব মঙ্গল হবে।" তখন শামা বলেন- আমার এই বইয়ের কোন দরকার নেই - রামদাসী এক পাগল, জেদী ও অত্যাধিক রাগী লোক। এক্ষুণি এসে অকারণেই ঝগড়া করতে শুরু করবে। এছাড়া আমি সংস্কৃত ভাষা তেমন জানিও না।" শামার ধারণা ছিল যে, বাবা তাঁর ও রামদাসীর মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি করতে চান, তাই তিনি এই ধরনের নাটক রচনা করেছেন। কিন্তু বাবার ওঁর প্রতি কি রকম (করুণার) ভাব ছিল, সেটা উনি বুঝতে পারেন নি। বাবা যেন-তেন-প্রকারেণ বিষ্ণু সহস্র নামের মালা শামার গলায় পরিয়ে দিতে চাইছিলেন। তিনি তো নিজের এক অল্পশিক্ষিত অন্তরঙ্গ ভক্তকে সাংসারিক দুঃখ থেকে মুক্তি প্রদান করতে চাইছিলেন। **ঈশ্বর নাম জপের মাহাত্ম্য তো সবাই জানে। এটি আমাদের পাপ থেকে বাঁচিয়ে, কু-প্রবৃত্তি হতে রক্ষা করে, জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত করে। আত্মশুদ্ধির জন্য এটি সবচেয়ে সহজ সাধনা, যাতে কোন সরঞ্জামের প্রয়োজন হয় না আর এতে কোন নিয়মের বন্ধনও নেই।** বাবা শুধু শামাকে দিয়ে এই সাধনাটি করাতে চাইতেন, কিন্তু শামা সে কথা বুঝতে পারছিলেন না। তাই বাবাকে এই ব্যাপারে চাপ দিতে হয়। এই ভাবেই অনেক আগে শ্রী একনাথ মহারাজ, নিজের এক প্রতিবেশী ব্রাহ্মণকে বিষ্ণু সহস্র নাম জপ করতে বলে ওকে রক্ষা করেন। বিষ্ণু সহস্র নাম জপ, চিত্তশুদ্ধির জন্য এক শ্রেষ্ঠ এবং সরল পথ। রামদাসী বাজার থেকে ওষুধ নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে আসে। আন্না চিঞ্চনীকর, 'নারদ

মুনি'র মতন এই ঘটনার সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত রামদাসীকে শোনান। রামদাসী রাগে শামার দিকে দৌড়ায়, "এ তোমারই কাজ। তুমিই বাবাকে দিয়ে আমায় ওষুধ আনতে পাঠালে। বইটা ফেরত না দিলে, আমি তোমার মাথা ভেঙ্গে দেবো।" শামা শান্ত ভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেন, কিন্তু ওঁর সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তখন বাবা স্নেহসিক্ত স্বরে বলেন- "আরে রামদাসী, একি কথা? উপদ্রব করছ কেন? শামা কি আমাদের আপন লোক নয়? তুমি ওকে মিছিমিছি কেন বকাবকি করছো? তুমি এত ঝগড়াটে হলে কি করে? একটু নম্র ও মৃদুভাষী হতে পারো না? তুমি রোজ এই পবিত্র গ্রন্থগুলি পাঠ করো, তবুও তোমার চিত্ত অশুদ্ধ। তোমার এই তীব্র উত্তেজনাই যখন তোমার বশে নেই, তখন তুমি কি ধরনের রামদাসী? তোমার তো সমস্ত বস্তু থেকে অনাসক্ত থাকা উচিত। এই বইটির প্রতি এত মোহ কেন? আশ্চর্যের কথা! সত্যিকারের রামদাসী তো সে, যে মমতা ত্যাগ করে সমদর্শী হতে পারে। তুমি তো শামার সাথে একটা বই নিয়ে ঝগড়া করছ। যাও গিয়ে নিজের আসনে বসো। টাকা দিয়ে তো বই অনেক পাওয়া যেতে পারে, মানুষ পাওয়া যায় না। মনে সুচিন্তা করে বিবেকবান হও। বইয়ের দামই বা কত? শামার সেটার কি প্রয়োজন? আমি স্বয়ং সেটি তুলে শামাকে দিয়েছিলাম। আমি ভাবলাম তোমার তো এটি কণ্ঠস্থ হয়ে গেছে। তাই শামাও এটি পাঠ করে কিছু লাভ পাক, তাই তাকে দিয়েছিলাম।" বাবার এই শব্দগুলি কত মধুর, মর্মগ্রাহী ও অমৃততুল্য। এর প্রভাব রামদাসীর উপরও পড়ে। ও একেবারে শান্ত হয়ে যায় এবং তারপর শামাকে বলে- "আমি এর বদলে পঞ্চরত্নী গীতা নেব।" তখন শামাও খুশী হয়ে বলেন- "একটা কেন, আমি তো তোমাকে এটির বদলে ১০টা দিতে রাজী আছি।" এই ভাবে এই বিবাদটি

শেষ হয়। কিন্তু এবার এই প্রশ্ন ওঠে যে, রামদাসী পঞ্চরত্নী গীতার (এমন একটি পুস্তক যার বিষয় ওর কখনো খেয়ালই হয়নি) জন্য এত আগ্রহান্বিত হল কেন? মস্‌জিদে যে রোজ ধার্মিক গ্রন্থ পাঠ করত, সে বাবার সামনে এত উৎপাত কিভাবে করল? আমরা জানি না এই দোষের নির্দিষ্টকরণ কিভাবে করা যেতে পারে এবং দোষী কে? আমরা শুধু এতটাই জানি যে, যদি এই প্রণালীটি অনুসরণ না করা হতো তাহলে বিষয়ের মাহাত্ম্য এবং ঈশ্বর নামের মহিমা ও বিষ্ণু সহস্র নাম পাঠের সু-ফল সম্পর্কে শামা অনবহিত রয়ে যেতেন। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা এটাই বুঝতে পারা যায় যে, বাবার উপদেশ দেওয়ার পদ্ধতি এবং তাঁর কার্যকলাপ ছিল অতুলনীয়। শামা ধীরে-ধীরে এই গ্রন্থটির এতটা অধ্যয়ন করেন এবং এমন ভাবে এটি রপ্ত করে নেন যে, শ্রীমান বুটী সাহেবের জামাই, প্রোফেসর জি.জি. নারকেকেও (এম.এ., ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজ, পুণে) তার যথার্থ অর্থ বোঝাতে সম্পূর্ণ রূপে সফল হন।

গীতা রহস্য ঃ-

যারা ব্রহ্মবিদ্যার (আধ্যাত্ম) অধ্যয়ন করত, বাবা তাদের সব সময় উৎসাহিত করতেন। একবার বাপুসাহেব যোগ একটা পার্শেল পান। তার মধ্যে শ্রী লোকমান্য তিলক কৃত 'গীতা রহস্য'-এর একটি কপি ছিল। উনি সেটা বগলে দাবিয়ে মস্‌জিদে আসেন। চরণ বন্দনা করার জন্য ঝুঁকতে গিয়ে, পার্শেলটি বাবার শ্রীচরণের উপর পড়ে যায়। তখন বাবা ওঁকে জিজ্ঞাসা করেন- "এতে কি আছে?" শ্রী যোগ তক্ষুনি বইটি বার করে, বাবার করকমলে রেখে দেন। বাবা কিছুক্ষণ ওর কয়েকটি পাতা উল্টে দেখেন। তারপর পকেট থেকে একটা টাকা বার করে সেটি বইটির উপর রেখে, যোগকে ফিরিয়ে দেন

এবং বলেন- "এইটি মন দিয়ে পড়ো, তোমার কল্যাণ হবে।"

শ্রীমান এবং শ্রীমতি খাপার্ডে ঃ-

এক সময় শ্রী দাদাসাহেব খাপার্ডে সপরিবারে শিরডী আসেন এবং কয়েক মাস সেখানেই থাকেন। ওঁর অবস্থানের নিত্য কার্য্যক্রমের বর্ণনা 'শ্রী সাইলীলা' পত্রিকার প্রথম ভাগে প্রকাশিত হয়েছিল। দাদা সাহেব সামান্য লোক ছিলেন না। উনি অমরাবতীর (বেরার) সুপ্রসিদ্ধ ও ধনশালী উকিল ছিলেন। উনি অত্যন্ত বিদ্বান এবং বিধান সভার সদস্য ছিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন এই ভদ্রলোক উচ্চ স্তরের বক্তা হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছিলেন। এত গুণবান হওয়া সত্ত্বেও, বাবার সামনে মুখ খোলার ওঁর সাহস হতো না। অনেক ভক্তই বাবার সঙ্গে কথা বলতেন ও যুক্তি-তর্কও করতেন। শুধু তিনজন ব্যক্তি- খাপার্ডে, নুলকর ও বুটীসাহেব সবসময় চুপ করে থাকতেন। ওঁরা অতি বিনম্র, ভদ্র ও মধুর স্বভাবের লোক ছিলেন। দাদা সাহেব বিদ্যারণ্য স্বামীর দ্বারা রচিত পঞ্চদশী নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থর (অদ্বৈত বেদান্তের তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ক) ব্যাখ্যা অন্যদের বোঝাতেন। কিন্তু যখন বাবার সামনে মস্‌জিদে আসতেন, তখন একটা শব্দও উচ্চারণ করতেন না। আসলে যে যতই বেদ-বেদান্তে পারঙ্গম হোক না কেন, ব্রহ্মপদে স্থিত ব্যক্তির সামনে ওর শুষ্ক জ্ঞান আলোকপাত করতে পারে না। দাদা সাহেব চার মাস ও ওঁর স্ত্রী সাত মাস শিরডীতে ছিলেন। ওঁরা দুজনেই শিরডী অবস্থানে অত্যন্ত সুখী হয়েছিলেন। শ্রীমতি খাপার্ডে ছিলেন এক শ্রদ্ধালু ও ভক্তিমতি মহিলা। ওঁর শ্রী সাইয়ের প্রতি প্রগাঢ় প্রেম ছিল। প্রতিদিন দুপুরে নিজে নৈবেদ্য নিয়ে মস্‌জিদে যেতেন। বাবা সেটা গ্রহণ করলে, তবে ফিরে এসে নিজে খাবার খেতেন। বাবা অন্যদেরও শ্রীমতি খাপার্ডের অটল শ্রদ্ধার ক্ষণিক

দর্শন করাতে চাইলেন। একদিন দুপুরে উনি সুজির পায়েস, লুচি, ভাত, পাঁপড় এবং অন্যান্য ভোজ্য পদার্থ নিয়ে মস্‌জিদে আসেন। অন্যান্য দিন বাবার প্রতীক্ষায় খাবার পড়ে থাকত। কিন্তু সেদিন তিনি তক্ষুনি উঠে খাবারের জায়গায় আসন গ্রহণ করেন। থালার উপর থেকে কাপড় সরিয়ে, সানন্দে খাবার খেতে শুরু করে দেন। তখন শামা বলেন- "এই পক্ষপাতিত্বের কারণ টি কি? অন্যদের থালার দিকে তো আপনি ফিরেও তাকান না বরং কখনো-কখনো সেগুলি সরিয়ে দেন। কিন্তু আজ আপনি খুবই উৎসুক ও খুশী হয়ে খাচ্ছেন। আজ এই মায়ের খাবার আপনার এত সুস্বাদু কেন লাগছে? বড়ই বিচিত্র ব্যাপার তো!" তখন বাবা নিম্নলিখিত ভাবে ব্যাপারটা বোঝান-

"সত্যি এই ব্যাপারটা বিচিত্র। পূর্বজন্মে এই মহিলাটি এক ব্যবসায়ীর গরু ছিল এবং প্রচুর দুধ দিত। পশুযোনি ছেড়ে, এ এক মালীর বাড়ীতে জন্ম নেয়। ঐ জন্মের পর, এক ক্ষত্রিয়ের বংশে জন্ম নিয়ে, বিয়ে করল এক ব্যবসায়ীকে। দীর্ঘকাল পর এর সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে। তাই এর থালা থেকে, চারটি গ্রাস খেয়ে নিতে দাও।" এই বলে বাবা পেট ভরে খেয়ে মুখ-হাত ধুয়ে, তৃপ্তির চার-পাঁচটা ঢেকুর তুলে নিজের আসনে এসে বসেন। শ্রীমতি খাপার্ডে বাবাকে প্রণাম করে, তাঁর চরণ সেবা করতে লাগলেন। বাবা ওঁর সাথে গল্প করতে শুরু করেন এবং সাথে-সাথে ওঁর হাতও টিপতে থাকেন। পরস্পরের এই সেবা দেখে শামা হেসে বলেন- "দেখো তো, এ কি অদ্ভুত দৃশ্য। ভগবান আর ভক্ত একজন অন্য জনের সেবা করছেন।" শ্রীমতি খাপার্ডের কপটহীন উৎসাহ দেখে, বাবা অত্যন্ত নরম ও মৃদু শব্দে বলেন- "এবার থেকে সর্বদা 'রাজারাম-রাজারাম' মন্ত্রের জপ কোর। যদি তুমি এর নিত্য অভ্যাস করো, তাহলে

জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে। শান্তি পাবে, অত্যধিক লাভ হবে।" আধ্যাত্মিক বিষয়ে অজ্ঞ লোকেরা এটিকে একটি অতি সাধারণ ঘটনা বলে মনে করতে পারে। কিন্তু শাস্ত্রের ভাষাতে এটিকে 'শক্তিপাত' বলা হয়, অর্থাৎ গুরু দ্বারা শিষ্যের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করা। বাবার শব্দগুলি এত শক্তিশালী ছিল যে, এক মুহূর্তে মহিলাটিকে প্রভাবিত করে ওঁর হৃদয়ে প্রবেশ করে সেখানে অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে। এই ঘটনাটি গুরু ও শিষ্যর সম্বন্ধের আদর্শের দ্যোতক। গুরু ও শিষ্য দুজনেই একে-অন্যকে অভিন্ন জেনে একজন-অন্যজনকে প্রেম ও সেবা করেন, কারণ ওঁদের মধ্যে কোন ভেদ নেই। তাঁরা দুজনে অভিন্ন এবং একই, একে-অন্যকে ছাড়া বাঁচতে পারেন না। শিষ্য গুরুদেবের চরণতলে-মাথা নত করছেন- এতো শুধু বাহ্যদৃশ্য মাত্র। আন্তরিক দৃষ্টিতে এরা দুজনে অভিন্ন এবং এক। তাঁদের মধ্যে যে ভেদ দেখে, সে এখনো অপরিপক্ক এবং অপূর্ণ।

।। श्री साईनाथार्पणमस्तु। शुभम् भवतु।।

অধ্যায় - ২৮

পাখীদের শিরডীতে টেনে আনা - ১) লক্ষ্মীচন্দ ২) বুরহানপুরের মহিলা ৩) মেঘার নির্বাণ।

শ্রী সাই অনন্ত। তিনি একটা পিঁপড়ে থেকে শুরু করে ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত সর্বভূতে ব্যাপ্ত। বেদ ও আত্ম বিজ্ঞানে পূর্ণ পারঙ্গম হওয়ার দরুণ তিনি ছিলেন সদ্‌গুরু উপাধির সম্পূর্ণ যোগ্য। বিদ্বান হয়েও যদি গুরু নিজের শিষ্যকে সজাগ করে তাকে আত্মস্বরূপের দর্শন না করাতে পারেন, তাহলে তাঁকে সদ্‌গুরু নামে কখনোই সম্বোধন করা যায় না। মাতা পিতা কেবল এই নশ্বর শরীরেরই জন্মদাতা। কিন্তু সদ্‌গুরু জন্ম ও মৃত্যু-দুটোর থেকেই মুক্তি পাইয়ে দেন। অতএব তিনি অন্য লোকেদের চেয়ে বেশী দয়াবান

শ্রী সাইবাবা সব সময় বলতেন-**"আমার ভক্ত এক হাজার ক্রোশ দূরে থাকলেও শিরডীর টানে এইভাবে আকর্ষিত হয়ে চলে আসে, যেমন সুতোয় বাঁধা চড়াইপাখী নিজেই চলে আসে।"** এই অধ্যায়ে এমনি তিনটি পাখীর বর্ণনা করা হয়েছে।

১) লালা লক্ষ্মীচন্দ ঃ-

এই ভদ্রলোক বম্বের শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর প্রেসে চাকরী করতেন। সেই চাকরীটা ছেড়ে উনি রেল বিভাগে আসেন এবং তারপর মেসার্স র‍্যালী ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানীতে কেরানি হিসাবে ঢোকেন। ১৯১০ সালে

ওঁর শ্রী সাইবাবার সাথে যোগাযোগ হয়। বড়দিনের (ক্রিসমাস্) প্রায় মাস দুই আগে, সান্তাক্রুজে থাকাকালীন, একটি স্বপ্ন দেখেন- এক দাড়ীওয়ালা বৃদ্ধকে ভক্তরা ঘিরে বসে আছে। এই ঘটনার কিছুদিন পর উনি নিজের বন্ধু শ্রী দত্তাত্রেয় মঞ্জুনাথ বিজয়ের বাড়ীতে দাসগণুর কীর্তন শুনতে যান। শ্রী দাসগণুর একটা নিয়ম ছিল যে, উনি কীর্তন করার সময় শ্রোতাদের সামনে শ্রী সাইবাবার ছবি সাজিয়ে রাখতেন। লক্ষ্মীচন্দ এই ছবিটি দেখে খুবই আশ্চর্যান্বিত হন, কারণ স্বপ্নে দেখা বৃদ্ধটির আকৃতি, হুবহু এই ছবিটির মতন ছিল। ওঁর বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, যিনি স্বপ্নে দর্শন দিয়েছিলেন তিনি শ্রী সাইনাথ ছাড়া আর কেউ নন। চিত্র-দর্শন, দাসগণুর মধুর কীর্তন এবং সন্ত তুকারামের উপর প্রবচন ইত্যাদির এমন একটা প্রভাব ওঁর উপর পড়ে যে, উনি শিরডী যাত্রার দৃঢ় সংকল্প করে ফেলেন। চিরকালই ভক্তরা এটা অনুভব করেছে যে, যে সদ্‌গুরু বা কোন আধ্যাত্মিক জ্ঞানের খোঁজে বেরোয়, তাকে ঈশ্বর পদে-পদে সাহায্য করেন। সেই রাতেই ওঁর এক বন্ধু, শঙ্কর রাও ওঁর বাড়ী আসেন এবং জিজ্ঞাসা করেন যে- "আপনি কি আমাদের সাথে শিরডী যাবেন?" এই কথা শুনে লক্ষ্মীচন্দের মন আনন্দে ভরে ওঠে এবং তক্ষুনি শিরডী যেতে প্রস্তুত হয়ে যান। এক মারোয়াড়ীর কাছ থেকে পনেরো টাকা ধার নিয়ে এবং অন্যান্য আবশ্যক ব্যবস্থা করে উনি শিরডী অভিমুখে রওনা হন। ট্রেনে বন্ধুর সাথে কিছুক্ষণ ভজন-কীর্তনও করেন। ঐ কামরায় চারজন মুসলমানও বসেছিল, যারা শিরডীর কাছেই নিজেদের বাড়ী ফিরছিল। লক্ষ্মীচন্দ তাদের কাছে শ্রী সাইবাবার বিষয় কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তখন তারা ওকে জানায়- "শ্রী সাইবাবা শিরডীতে অনেক বছর ধরে আছেন এবং উনি এক খুবই উচ্চ শ্রেণীর সন্ত।" কোপরগ্রামে পৌঁছে লক্ষ্মীচন্দের বাবার জন্য কিছু পেয়ারা কেনার ইচ্ছে হয়। কিন্তু একটু

পরই সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যময় দৃশ্য দেখতে এতো মগ্ন হয়ে যান যে, পেয়ারার কথা একেবারেই ভুলে যান।। ঠিক শিরডীর কাছাকাছি পৌঁছে ওঁর পেয়ারা কেনার কথা মনে পড়ে। ইতিমধ্যে উনি একটি বৃদ্ধাকে টুকরী নিয়ে টাঙ্গার পেছনে দৌড়ে-দৌড়ে আসতে দেখেন। এই দেখে উনি টাঙ্গা থামান এবং টুকরীতে পেয়ারা দেখে কিছু ভালো পেয়ারা কিনে নেন। তখন ঐ বৃদ্ধাটি ওঁকে বলেন- "দয়া করে এই বাকি পেয়ারা গুলোও, আমার হয়ে বাবাকে অর্পণ করে দেবেন।" এই কথা শুনতেই লক্ষ্মীচন্দের মনে হয়- "আমার পেয়ারা কেনার যে ইচ্ছেটা ছিল এবং যেটা আমি পরে ভুলে যাই, সেটা এই বৃদ্ধা আমায় মনে করিয়ে দিল।" শ্রী সাইবাবার প্রতি ঐ বৃদ্ধার ভক্তি দেখে ওঁরা দুজনেই স্তম্ভিত হয়ে যান। তখন লক্ষ্মীচন্দ ভাবলেন যে- 'যে বৃদ্ধকে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম এই বৃদ্ধা বোধহয় তাঁরই কোন আত্মীয়া।" শিরডী পৌঁছতেই দূর থেকেই মস্‌জিদের ধ্বজাকে প্রণাম করেন। হাতে পূজোর সামগ্রী নিয়ে মস্‌জিদে পৌঁছন। তিনি বাবার বিধিসম্মত ভাবে পূজা-অর্চনা করে তৃপ্তি অনুভব করেন। বাবাকে দর্শন করে উনি অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং তাঁর চরণ দুটি এমন ভাবে জড়িয়ে ধরেন, যেমন একটি মৌমাছি পদ্মফুলের মকরন্দের সুগন্ধে মুগ্ধ হয়ে তাকে আঁকড়ে ধরে। তখন বাবা ওঁকে যা-যা বলেন সেটা হেমাডপন্ত নিজের মূল গ্রন্থে এই ভাবে বর্ণনা করেছেন, "ব্যাটা, রাস্তায় ভজন-কীর্তন করে এবং অন্য লোকেদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে। অন্যদের জিজ্ঞাসা করার কি দরকার? সব কিছু নিজের চোখেই দেখো। কেন অন্যকে জিজ্ঞাসা করা? স্বপ্ন মিথ্যে না সত্যি? এবার নিজেই বিচার করে নাও। মারোয়াড়ীর কাছ থেকে ধার নেওয়ার কি দরকার ছিল? মনের ইচ্ছে কি পূরণ হলো?" এই শব্দগুলি শুনে, বাবার সর্বব্যাপকতা অনুভব করে লক্ষ্মীচন্দ বিস্মিত হন। উনি

হতভম্ব হয়ে গেলেন যে, বাড়ী থেকে শিরডী পর্যন্ত রাস্তায় যা যা ঘটেছিল, সে সব কথা বাবা জানতেন। এখানে লক্ষ্য করার মত বিষয় হল এই যে, **ঋণ নিয়ে তাঁকে দর্শন করতে আসা বা ধার করে তীর্থ যাত্রা বা আনন্দোৎসব করা, বাবা পছন্দ করতেন না।**

'সাঁজা' (এক রকমের সুজীর পায়েস)

দুপুরে খাওয়ার সময়, এক ভক্তের কাছ থেকে 'সাঁজা'র প্রসাদ পেয়ে লক্ষ্মীচন্দ খুব খুশী হন। পরের দিনও উনি 'সাঁজা'র আশাতেই বসেছিলেন, কিন্তু সেদিন আর কোন ভক্ত সেই প্রসাদ বিতরণ করল না। তৃতীয় দিন, বাপুসাহেব যোগ বাবাকে জিজ্ঞাসা করেন, কিসের নৈবেদ্য অর্পণ করা হবে? বাবা ওঁকে 'সাঁজা' আনতে বলেন। ভক্তরা দুটো বড় পাত্র ভরে 'সাঁজা' নিয়ে আসেন। লক্ষ্মীচন্দের ক্ষিধেও খুব জোরে পেয়েছিল। ওঁর পিঠেও একটা ব্যথা হচ্ছিল। বাবা লক্ষ্মীচন্দকে বলেন- "তোমার ক্ষিধে পেয়েছে, তাই না? ভালো কথা। কোমরে ব্যথাও হচ্ছে? নাও এবার 'সাঁজা'ই ওষুধ হিসেবে খাও।' লক্ষ্মীচন্দ আবার খুব অবাক হয়ে যান যে, ওঁর মনের সব কথাগুলি বাবা কি করে জেনে ফেললেন। নিশ্চয় উনি সর্বজ্ঞ!

কু-দৃষ্টি ঃ-

এই যাত্রাতেই ওঁর একবার 'চাওড়ী' শোভা যাত্রা দেখার সৌভাগ্য হয়। সেদিন বাবার কাশি ও শ্লেষ্মার দরুণ, শরীরটা খুব খারাপ লাগছিল। লক্ষ্মীচন্দ ভাবেন, বাবার নিশ্চয়ই কারো নজর লেগে গেছে। তাই তিনি এইরকম কষ্ট পাচ্ছেন। পরের দিন সকালবেলা

মস্‌জিদে বাবা শামাকে বলেন, "গতকাল যে আমার কষ্ট হচ্ছিল তার কারণ অবশ্যই কারুর কু-দৃষ্টি। আমার মনে হচ্ছে, আমার বোধহয় কারো নজর লাগল। তাই আমার এত কষ্ট হচ্ছে।" লক্ষ্মীচন্দের মনের কথাটা বাবা এইভাবে প্রকাশ করেন। বাবার সর্বজ্ঞতার অনেক প্রমাণ ও ভক্তদের প্রতি বাবার স্নেহ দেখে, লক্ষ্মীচন্দ বাবার চরণে পড়ে বলেন- "আপনার অপূর্ব দর্শন পেয়ে খুবই আনন্দ হচ্ছে। আমার মন-মধুপ আপনার চরণ পদ্মে এবং ভজনগানেই যেন নিমগ্ন থাকে। আপনি ছাড়া আর কোন ঈশ্বর আছে বলে আমি জানি না। কৃপা ও স্নেহ দিয়ে এই দাসকে রক্ষা করে তার কল্যাণ করুন। আপনার ভবভয়নাশক চরণ স্মরণ করতে-করতেই যেন আমার জীবন আনন্দে কেটে যায়, এই আমার আপনার কাছে বিনম্র প্রার্থনা।"

বাবার আশীর্বাদ ও উদী পেয়ে খুবই আনন্দিত ও সন্তুষ্ট হন। বন্ধুর সাথে সারা রাস্তা বাবার লীলার গুণগান করতে-করতে, উনি বাড়ী ফিরে আসেন। বলা বাহুল্য, এর পর উনি বাবার অনন্য ভক্ত হয়ে ওঠেন। শিরডী যাত্রীদের হাতে উনি বাবার জন্য মালা, কর্পূর ও দক্ষিণা পাঠাতেন।

২) বুরহানপুরের মহিলা ঃ-

এবার এই দ্বিতীয় পাখীটির (ভক্ত) বর্ণনা করা হবে। একদিন বুরহানপুরের এক মহিলা স্বপ্নে দেখেন যে শ্রী সাইবাবা ওঁর দরজায় দাঁড়িয়ে খিচুড়ী চাইছেন। ঘুম থেকে উঠে দরজায় কাউকে দেখতে পান না। তবুও স্বপ্নের কথা ভেবে ওঁর খুব ভালো লাগে এবং নিজের স্বামী ও অন্যান্য লোকদের স্বপ্নের কথাটা জানান। ওঁর স্বামী ডাক বিভাগে কাজ করতেন। ওঁরা দুজনেই খুব ধার্মিক প্রকৃতির লোক

ছিলেন। যখন আকোলায় স্থানান্তরণ হয়, তখন ওঁরা শিরডী যাওয়া স্থির করেন। একটা শুভদিন দেখে শিরডীর জন্য রওনা হন। পথে গোমতী তীর্থ হয়ে ওঁরা শিরডী পৌঁছান এবং সেখানে দু'মাস থাকেন। প্রতি দিন ওঁরা মস্‌জিদে যেতেন এবং বাবার পূজো করে আনন্দে সময় কাটাতেন। যদিও ঐ দম্পতি বাবাকে খিচুড়ী ভোগ অর্পণ করতে এসেছিলেন, কিন্তু কোন-না-কোন কারণে, চৌদ্দ দিন অবধি ওঁদের সেই সুযোগ আর মেলে না। কিন্তু ঐ মহিলা এই কাজে আর দেরী করতে চাইতেন না। পনেরো দিনের দিন, খিচুড়ী নিয়ে মস্‌জিদে পৌঁছে দেখেন বাবা অন্য লোকেদের সাথে খেতে বসে গেছেন। পর্দা টানা হয়ে গেলে, কেউ ভেতরে প্রবেশ করার সাহস করত না। কিন্তু উনি আর এক দণ্ডও প্রতীক্ষা করতে পারছিলেন না। হাত দিয়ে পর্দা সরিয়ে, সোজা ভেতরে ঢুকে যান। খুবই আশ্চর্য্যের কথা যে বাবার সেদিন সব চেয়ে আগে খিচুড়ী খেতে ইচ্ছে করছিল। মহিলাটি থালা নিয়ে ভেতরে ঢুকতেই, বাবা খুব খুশী হন ও তার থেকেই খিচুড়ীর দলা নিয়ে খেতে শুরু করেন। বাবাকে এইরূপ আগ্রহান্বিত দেখে প্রত্যেকেই খুব অবাক হয়। পরে যে-যে এই খিচুড়ীর গল্পটি শোনে, ভক্তদের প্রতি বাবার স্নেহ দেখে তার খুবই আনন্দ হয়।

মেঘার নির্বান ঃ-

এবার তৃতীয় মহান পাখীর গল্প শুনুন। বিরমগাঁওর মেঘা ছিল রাও বাহাদুর হরি বিনায়ক সাঠের একজন সরল, নিরক্ষর ব্রাহ্মণ রাঁধুনি। সে শিবের পরম ভক্ত ছিল ও সর্বদা পঞ্চাক্ষরীয় মন্ত্র 'ওঁ নমো শিবায়' এর জপ করত। সন্ধ্যা উপাসনা ইত্যাদি ও কিছুই জানত না, এমনকি সন্ধ্যার মূল গায়ত্রী মন্ত্র পর্যন্ত জানত না। রাও বাহাদুর

ওকে খুবই স্নেহ করতেন। তাই ওকে সন্ধ্যার বিধি এবং গায়ত্রী মন্ত্র শিখিয়ে দেন। 'শ্রী সাইবাবা শিবের সাক্ষাৎ অবতার' এই বলে, শ্রী রাওবাহাদুর মেঘাকে শিরডী পাঠাবেন ঠিক করেন। কিন্তু শ্রী সাঠেকে জিজ্ঞাসা করায়, মেঘা জানতে পারে যে, শ্রী সাইবাবা তো মুসলমান। তাই মেঘা ভাবে যে, শিরডী গিয়ে এক মুসলমানকে প্রণাম করতে হবে, এটা তো ঠিক কথা নয়। সাদাসিধা তো সে ছিলই, তাই ওর মনে অশান্তি সহজেই দেখা দেয়। তখন সে নিজের মালিককে প্রার্থনা করে- "দয়া করে আমাকে সেখানে পাঠাবেন না।" কিন্তু সাঠেসাহেব ওর কথা শুনতে মোটেই রাজী ছিলেন না। ওঁর সামনে মেঘার অনুরোধ টিঁকল না। সাঠেসাহেব নিজের শ্বশুর শ্রী গণেশ দামোদর ওরফে দাদা কেলকরকে (যিনি শিরডীতেই থাকতেন) একটা চিঠি লেখেন- 'মেঘার পরিচয় বাবার সাথে করিয়ে দেবেন' এবং মেঘাকে চিঠিটি দিয়ে কোন রকমে শিরডী পাঠিয়ে দেন। শিরডী পৌঁছে, মেঘা মস্‌জিদের ঢুকতে যাবে এমন সময়, বাবা অত্যন্ত রেগে ওঠেন। ওকে মস্‌জিদে ঢুকতে মানা করে দেন। তিনি গর্জন করে বলেন- "একে বাইরে বার করে দাও।" তারপর মেঘার দিকে তাকিয়ে বলেন, "তুমি এক উচ্চ কুলীন ব্রাহ্মণ এবং আমি নিম্ন জাতির এক মুসলমান। এখানে এলে তোমার জাত যাবে। তাই এখান থেকে বেরিয়ে যাও।" এই কথা শুনে মেঘা কেঁপে ওঠে এবং খুবই বিস্মিত হয় যে, ওর মনের কথাগুলি বাবা কি করে জানতে পারলেন! কোন ক্রমে ও শিরডীতে কিছুদিন থাকে এবং নিজের সাধ্যমত সেবাও করে। কিন্তু ওর তৃপ্তি হয় না। ও বাড়ী ফিরে আসে এবং সেখান থেকে ত্র্যয়ম্বক (জেলা নাসিক) চলে যায়। পুরো এক বছর পর ও আবার শিরডী আসে এবং এবার দাদা কেলকরের বলাতে, মস্‌জিদে ঢোকার

সুযোগও পায়। শ্রী সাইবাবা মৌখিক উপদেশ দ্বারা মেঘার উন্নতি করার চেয়ে ওর হৃদয় পরিবর্তন এবং সংশোধন করতে চাইছিলেন। ফলে মেঘার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। এখন ও শ্রী সাইবাবাকে সাক্ষাৎ শিবেরই অবতার বলে মানত। শিব পূজোয় বেলপাতা নিতান্তই আবশ্যক। নিজের শিবের (শ্রী বাবা) পূজোর জন্য বেলপাতার খোঁজে সে অনেক দূর অবধি চলে যেতো। প্রতিদিনের তার এই নিয়ম ছিল যে, গ্রামে যতগুলি দেবালয় ছিল, আগে সেখানে গিয়ে পূজো করত এবং তার পর মস্‌জিদে এসে বাবাকে প্রণাম করে, কিছুক্ষণ চরণ সেবা করে চরণামৃত পান করত। একবার খাণ্ডোবা মন্দিরের দরজা বন্ধ থাকায়, পূজো না, করেই মস্‌জিদে ফিরে আসে। কিন্তু মস্‌জিদে বাবা ওর সেবা স্বীকার করেন না এবং ওকে আগে খাণ্ডোবা মন্দিরে পূজো করে আসতে বলেন। বাবা ওকে জানান যে, মন্দিরের দ্বার খুলে গেছে। যথারীতি পূজো করে ফিরে আসার পরই বাবা ওকে তাঁর পূজো করার অনুমতি দেন।

গঙ্গাস্নান ঃ-

একবার মকর সংক্রান্তির দিন মেঘার ইচ্ছে হয় যে, সে বাবাকে চন্দন লাগিয়ে গঙ্গাজল দিয়ে স্নান করাবে। বাবা প্রথমে এ বিষয়ে স্বীকৃতি দেন না। কিন্তু ওর নিরন্তর প্রার্থনার পর, উনি কোনরকমে রাজী হন। গোদাবরী নদীর পবিত্র জল আনার জন্য আট ক্রোশ দূরে যেতে হতো। দুপুরের মধ্যে মেঘা সব ব্যবস্থা করে ফেলে। এরপর ও বাবাকে তৈরী হয়ে নিতে বলে। বাবা আবার মেঘাকে অনুরোধ করেন- "আমায় এই ঝঞ্ঝাট থেকে দূরে থাকতে দাও। আমি তো এক ফকির, গঙ্গাজলে স্নান করে কি করব?" কিন্তু মেঘা

কোন কথা শুনতে রাজী নয়। তার দৃঢ় ধারণা- 'শিবঠাকুর গঙ্গাজল পেয়ে খুব খুশী হন। তাই এই রকম শুভ পর্বে, নিজের শিবঠাকুরকে স্নান করানো আমাদের পরম কর্তব্য।' এবার বাবাকে রাজী হতেই হলো। বাবা নীচে নেমে একটা পিঁড়িতে বসে মাথাটা এগিয়ে দিয়ে বলেন- "শুধু মাথাতেই জল ঢেলো। মাথাই শরীরের প্রধান অঙ্গ। তার উপর জল ঢালা আর পুরো শরীরের উপর জল ঢালা সমান।" মেঘা, 'আচ্ছা, আচ্ছা' বলতে-বলতে পাত্রটা বাবার গায়ে উপুড় করে দিল। তারপর খালি পাত্রটা একদিকে রেখে, বাবার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। একি আশ্চর্য কাণ্ড! বাবার কেবল মাথাটাই ভিজেছে এবং বাকী শরীরটা যেমন কে তেমন শুকনোই রয়েছে।

ত্রিশুল এবং পিণ্ডী ঃ-

মেঘা বাবাকে দু জায়গায় পূজো করত। প্রথমে মস্‌জিদে সশরীরে বাবাকে পূজো করত এবং তারপর ওয়াড়ায় ফিরে নানাসাহেব চাঁদোরকরের দেওয়া বড় ছবিটাকে। এই ভাবে এই নিত্যকর্ম বারো মাস চলে। বাবা ওর ভক্তি ও বিশ্বাস দৃঢ় করার জন্য ওকে দর্শন দেন। একদিন ভোরবেলা যখন মেঘা চোখ বুজে বিছানায় শুয়েছিল, তখন ও বাবার দর্শন পায়। বাবা ওকে জাগ্রত জেনে কিছু কুমকুম মেশানো চাল ("অক্ষত") ছড়িয়ে দেন এবং বলেন- "মেঘা, একটা ত্রিশুল আঁকো।" এই বলে তিনি অদৃশ্য হয়ে যান। মেঘা উৎসুক হয়ে চোখ খোলে কিন্তু কাউকে দেখতে পায় না। শুধু এখানে-ওখানে চালের দানা ছড়ানো ছিল। এরপর মস্‌জিদে গিয়ে বাবাকে নিজের স্বপ্নের কথা বলে, ত্রিশুল টানার অনুমতি চায়। বাবা বলেন- "তুমি কি আমার কথা শোননি? আমি তো বললাম 'ত্রিশুল আঁকো।'

ওটা কোন স্বপ্ন নয় বরং আমারই প্রত্যক্ষ আদেশ। আমার কথা সর্বদা অর্থপূর্ণ হয়, আমি আজে-বাজে কথা বলি না।" মেঘা সে কথা স্বীকার করে বলে- "আপনি দয়া করে আমায় ঘুম থেকে জাগিয়েও দিয়েছিলেন। কিন্তু সব কটি দরজা বন্ধ দেখে, এই মূঢ় ব্যক্তির ভ্রান্তি হয় যে, বোধহয় সেটা স্বপ্নই ছিল।" বাবা উত্তর দেন- **"প্রবেশ করার জন্য আমার কোন দরজার দরকার হয় না। যে আমার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে সর্বদা আমারই চিন্তন করে, তার সব কাজ আমিই স্বয়ং করি এবং শেষে তাকে শ্রেষ্ঠ (চরম) গতি প্রদান করি।"** মেঘা নিজের বাসস্থানে ফিরে, বাবার ছবির কাছে দেওয়ালে একটা লাল ত্রিশুল আঁকে। পরের দিন এক রামদাসী ভক্ত পুণে থেকে শিরডী এসে পৌঁছয়। ও বাবাকে প্রণাম করে একটি শিবলিঙ্গ উপহার দেয়। সেই সময় মেঘাও সেখানে এসে পৌঁছয়। তখন বাবা ওকে বলেন- "দেখো, ভোলাশঙ্কর এসে গেছেন। এবার এঁকে সামলাও।" মেঘা তার উপর ত্রিশুল আঁকা দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হয়। কাকা সাহেব দীক্ষিত স্নান করে মাথার উপর গামছা দিয়ে, 'সাই' নাম জপ করছিলেন। এমন সময় মানস চক্ষে দেখলেন এক শিবলিঙ্গ। ওঁর একটু কৌতুহল হয়। ঠিক সেই সময় মেঘা মস্‌জিদ থেকে ফিরেছে। মেঘা বাবার দেওয়া শিবলিঙ্গটি কাকাকে দেখায়। শিবলিঙ্গটি ঠিক সেরকমই ছিল, যেমনটি কাকাসাহেব একটু আগে দেখেছিলেন। ত্রিশুল টানার কিছুদিনের মধ্যেই বাবা বড় ছবিটির (যেটির পূজো মেঘা নিত্য করত) কাছে ঐ লিঙ্গটি স্থাপনা করে দেন। মেঘা শিব পূজো খুব ভালবাসত। ত্রিশুল টানার সুযোগ দিয়ে ও লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে বাবা ওর বিশ্বাস দৃঢ় করে দেন।

এই ভাবে অনেক বছর ধরে দুপুর ও সন্ধ্যার সময় নিয়মিতভাবে আরতি এবং পূজো করে **১৯১২** সালে মেঘা পরলোক গমন করে। বাবা ওর মৃত শরীরের উপর হাত বুলিয়ে বলেন, "এ আমার সত্যিকারের ভক্ত ছিল।" তারপর বাবা নিজের খরচায় ব্রাহ্মণ ভোজন করাবার আদেশ দেন, যেটা কাকাসাহেব দীক্ষিতের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

সপ্তাহ পারায়ণ ঃ চতুর্থ বিশ্রাম

অধ্যায় - ২৯

১) মাদ্রাজী ভজন-মণ্ডলী ২) তেন্ডুলকর (পিতা ও পুত্র) ৩) ডাক্তার ক্যাপ্টেন হাটে এবং ৪) বামন নার্বেকরের গল্প।

১) মাদ্রাজী ভজনাকারী মেলা ঃ-

১৯১৬ সাল নাগাদ এক মাদ্রাজী ভজন মণ্ডলী পবিত্র কাশীর তীর্থ করতে বেরোয়। ঐ মণ্ডলীতে একটি পুরুষ, তার স্ত্রী, ছেলে ও শ্যালিকা ছিল। রাস্তায় ওরা জানতে পারে যে, আহমদনগরে কোপরগ্রামের কাছে শিরডী গ্রামে শ্রী সাইবাবা নামে এক মহান সন্ত থাকেন। তিনি খুবই দয়ালু ও উচ্চ শ্রেণীর সাধু। তাঁর হৃদয় খুবই উদার এবং তিনি কৃপার সাগর। তিনি প্রতিদিন ভক্তদের টাকা বিতরণ করেন। যদি কোন শিল্পী সেখানে গিয়ে নিজের নৈপুণ্য প্রদর্শন করে তো সেও পুরষ্কার পায়। প্রতিদিন বাবার কাছে দক্ষিণা রূপে অনেক টাকা জড়ো হতো। বাবা তার থেকে রোজ একটাকা ভক্ত কোণ্ডাজীকে, তিন বছরের মেয়ে অমলীকে, ছ টাকা অমলীর মা জমলীকে এবং কখনো দশ বা কুড়ি বা কখনো-কখনো পঞ্চাশ টাকাও নিজের ইচ্ছানুসারে অন্য ভক্তদের মধ্যে ভাগ করে দিতেন। এই শুনে ভজন মণ্ডলীও শিরডী এসে পৌঁছয়। ওরা খুব সুন্দর ভজন ও গান করত, কিন্তু ওদের আসল ইচ্ছে ধন উপার্জন করাই ছিল। ঐ দলে তিনটে লোক বড়ই লোভী ছিল। শুধু প্রধান স্ত্রীটির স্বভাব ছিল এদের মধ্যে একেবারেই ভিন্ন। ওর হৃদয়ে বাবার প্রতি শ্রদ্ধা ছিল। এক দিন দুপুরের আরতির সময় ঐ মহিলাটির ভক্তি ও বিশ্বাস

দেখে বাবা প্রসন্ন হন। তারপর আর কি? বাবা ওকে ওর ইষ্টের রূপে দর্শন দেন এবং শুধু ওই বাবাকে সীতানাথ রূপে দেখতে পায়। সেখানে উপস্থিত অন্যান্য লোকেরা তাঁকে বাবা রূপেই দেখে। নিজের প্রিয় ইষ্ট দেবের দর্শন পেয়ে আনন্দে মহিলাটির কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে চোখ থেকে অশ্রু ধারা প্রবাহিত হতে থাকে। প্রেমোন্মাদ হয়ে ও তালি বাজাতে শুরু করে। ওকে এই রূপ আত্মহারা হতে দেখে লোকেদের কৌতূহল হয়, কিন্তু কেউ কারণটা জানতে পারে না। পরে ও নিজের স্বামীকে সমস্ত কথা খুলে বলে। বাবা ওকে কিভাবে শ্রীরাম রূপে দর্শন দেন, সে সব জানায়। কিন্তু ওর স্বামী ভাবে যে- "আমার স্ত্রী খুবই ধার্মিক ও সরল। সুতরাং শ্রীরামের দর্শন পাওয়াটা, ওর একটা মনের ভ্রম বিকার ছাড়া আর কিছুই নয়।" ও নিজের স্ত্রীর কথা উপেক্ষা করে বলে- "এটা কি করে সম্ভব যে, বাবা শুধু তোমাকেই শ্রীরাম রূপে দর্শন দিলেন আর বাকি সব ভক্তরা বাবারই দর্শন পেলো।" ওর স্ত্রী এর উত্তরে কোন প্রতিবাদ করল না, কারণ ঐ সময় যে ভাবে ও শ্রীরামের দর্শন পেয়েছিল, ঠিক সেরকমই দর্শন এখনো পাচ্ছিল। ওর মন শান্তি, স্থিরতা ও তৃপ্তি লাভ করে।

আশ্চর্যজনক দর্শন ঃ-

এই ভাবে দিন কাটতে থাকে। এক রাতে পুরুষটি একটা বিচিত্র স্বপ্ন দেখে যে, একটা বড় শহরে পুলিশ ওকে ধরে দড়ি দিয়ে হাত বেঁধে কারাগারে বন্ধ করে দিয়েছে। বাবা চুপচাপ ওর কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে নিজের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ও কাতর ভাবে বলে ওঠে- "আপনার কীর্তি শুনে, আমি আপনার শ্রীচরণে এসেছিলাম। আপনার এত কাছে থাকা সত্ত্বেও, আমার এরকম বিপদ কি করে

হলো?" তখন বাবা বলেন- "তোমাকে নিজের কু-কর্মের ফল ভুগতে হবে।" ও তখন উত্তর দেয়- "এই জন্মে আমার সে রকম কোন কর্মের কথা মনে নেই, যার জন্য আমায় এই দুর্দিন দেখতে হচ্ছে।" বাবা বলেন- "এই জন্মে নয় তো গত জন্মে নিশ্চয়ই কোন খারাপ কাজ করেছিলে।" তখন লোকটি বলে- "আমার গত জন্মের কথা তো কিছু মনে নেই। কিন্তু ধরুন কোন ভুল কাজ করেও যদি ফেলেছিলাম, তবুও আপনার উপস্থিতিতে সেটা তক্ষুনি জ্বলে ছাই হয়ে যাওয়া উচিত ছিল, যেমন শুকনো ঘাস আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।" বাবা জিজ্ঞাসা করেন- "তোমার কি সত্যি-সত্যি এরকম দৃঢ় বিশ্বাস আছে?" লোকটি উত্তর দেয়- "হ্যাঁ"। বাবা তখন ওকে চোখ বন্ধ করতে বলেন এবং চোখ বন্ধ করতেই ও একটা ভারী জিনিষ পড়ার শব্দ পায়। চোখ খুলে ও দেখে যে, ও কারাগারের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে এবং পুলিশটা মাটিতে পড়ে আছে ও তার গা থেকে রক্ত পড়ছে। এই দেখে ও অত্যন্ত ভীত দৃষ্টিতে বাবার দিকে তাকায়। তা দেখে বাবা বলেন- "ব্যাটা, এইবার তোমার ভালো ব্যবস্থা করা হবে। পুলিশ এসে এক্ষুনি তোমায় ধরে নেবে।" তখন ও মিনতি করে বলে- "আপনি ছাড়া আমায় কে রক্ষা করতে পারে? আমার তো একমাত্র আপনিই ভরসা। ভগবান! আমায় যেমন করে হোক্ বাঁচিয়ে নিন।" তখন বাবা ওকে আবার চোখ বন্ধ করতে বলেন। চোখ খুলে দেখে যে, ও সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে কাঠগড়ার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, এবং বাবাও ওর কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন। তখন ও বাবার শ্রীচরণে লুটিয়ে পড়ে। বাবা এবার জিজ্ঞাসা করেন- "আমায় বলো তো, তোমার এখনকার প্রণামটি ও আগের প্রণামগুলির মধ্যে, কোন পার্থক্য আছে কি না? ভালো ভাবে ভেবে জবাব দিও।"

লোকটি বলে- "আকাশ -পাতাল পার্থক্য আছে, আমার এখনকার ও আগের প্রণামের মধ্যে। আগের প্রণামগুলি তো শুধু ধন-প্রাপ্তির আশায় করেছিলাম। কিন্তু এই প্রণামটি আমি আপনাকে ঈশ্বর জেনে করেছি। আগে আমার ধারণা ছিল যে, আপনি মুসলমান হয়ে হিন্দুদের ধর্ম নষ্ট করছেন।" বাবা জিজ্ঞাসা করেন- "তুমি কি মুসলমান পীরদের বিশ্বাস করো না?" প্রত্যুত্তরে সে বলে- "আজ্ঞে না।" তখন বাবা আবার জিজ্ঞাসা করেন- "তোমার বাড়ীতে কি একটা পাঞ্জা নেই? তুমি কি 'তাবুতের' (শবাধার) পূজো করো না? তোমার বাড়ীতে এখনও কাডবীবী নামে এক দেবী আছেন, যার সামনে তুমি বিয়ে ও অন্যান্য ধার্মিক অবসরে কৃপা প্রার্থনা করো।" শেষে যখন ও সব স্বীকার করে, তখন বাবা বলেন- "এর চেয়ে বেশী তুমি আর কি প্রমাণ চাও?" তখন লোকটি নিজের গুরু শ্রীরামদাসের দর্শন করার ইচ্ছে প্রকাশ করে। বাবার আদেশে ও পিছনে ফিরে দেখে যে, শ্রীরামদাস স্বামী ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন এবং যেই ও তাঁর চরণ ছুঁতে যায়, তক্ষুনি তিনি অদৃশ্য হয়ে যান।

তখন ও বাবাকে বলে- "আপনাকে দেখে তো বেশ বৃদ্ধ মনে হয়। আপনি নিজের বয়স জানেন?" বাবা তখন বলেন, "তুমি কি বলতে চাও, আমি বৃদ্ধ? বেশ, কিছুদূর আমার সঙ্গে দৌড়ে দেখাও দেখি।" এই বলে বাবা দৌড়াতে শুরু করেন এবং সেও বাবার পিছন-পিছন দৌড়ায়। দৌড়াতে গিয়ে পা দিয়ে যে ধূলো ওড়ে বাবা তাতে অদৃশ্য হয়ে যান এবং তখনই ওর ঘুম ভেঙ্গে যায়। ও গভীর ভাবে এই স্বপ্নটির বিষয় চিন্তা করে। ওর মানসিক প্রবৃত্তিতে সম্পূর্ণ পরিবর্তন দেখা দেয়। এবার ও বাবার মহানতা বুঝে গিয়েছিল। ওর লোভী ও শঙ্কাগ্রস্ত বৃত্তি দূর হয়ে যায় এবং বাবার চরণের প্রতি সত্যিকারের

ভক্তি উথলে পড়ে। ওটা ছিল তো মাত্র একটা স্বপ্ন, কিন্তু তার প্রশ্নোত্তরগুলি বেশী গুরুত্বপূর্ণ। পরের দিন যখন সবাই মস্‌জিদে আরতির জন্য একত্রিত হয়, তখন বাবা ওদের প্রসাদ রূপে, প্রায় দু'টাকার মিষ্টি ও নগদ দু টাকা দিয়ে আশীর্বাদ করেন। ওখানে কিছু দিন আরো থাকতে বলে, আশিস দেন- "আল্লাহ তোমায় অনেক দেবেন এবং এবার সব ভালোই করবেন।" সেখানে বাবার কাছ থেকে খুব বেশী অর্থ লাভ হয় না, কিন্তু বাবার কৃপা অবশ্যই প্রাপ্ত হয়, যাতে ওঁদের খুবই মঙ্গল হয়। রাস্তায় ওরা যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করে এবং ওদের ঐ যাত্রা সফল হয়। যাত্রায় সেই দলের কোন কষ্ট বা অসুবিধে হয় না, এবং ওরা নির্বিঘ্নে বাড়ী পৌঁছে যায়। বাবার আশীর্বাদে এবং তাঁর কৃপায় যে পরমানন্দ লাভ হয়েছিল, সেটা ওদের চিরকাল মনে থাকে।

তেণ্ডুলকর কুটুম্ব ঃ-

বম্বের কাছে বান্দ্রাতে এক তেন্ডুলকর পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্য বাবার পরম ভক্ত ছিল। শ্রী রঘুনাথ রাও তেন্ডুলকর মারাঠী ভাষায় 'শ্রী সাইনাথ ভজনমালা" নামক একটি বই লিখেছেন যাতে প্রায় আটশোটা ছন্দ ও পদের সমাবেশ ও বাবার লীলার মধুর বর্ণনা দেওয়া আছে। এইটি বাবার ভক্তদের পড়ার যোগ্য বই। ওঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু, ডাক্তারী পরীক্ষায় বসার জন্য উঠেপড়ে লেখাপড়া করছিল। অনেক জ্যোতিষীদেরও ও নিজের কুষ্ঠী দেখায় এবং সবাই জানায় যে সে বছর ওর গ্রহদশা ভালো না হওয়ার দরুণ, পরের বছর পরীক্ষায় বসলে ও নিশ্চয়ই সফল হবে। এই শুনে, ও খুব নিরাশ হয়। ছেলেটির মা মনের অশান্তির এই কথাটি বাবাকে বলেন। ছেলের কিছুদিন পরই পরীক্ষায় বসার কথা। বাবা বললেন- "ছেলেকে বলো

আমার উপর বিশ্বাস রাখতে। সব ভবিষ্যবাণী ও জ্যোতিষীদের কুষ্ঠী এক কোণে ফেলে দাও। ও নিজের লেখাপড়া চালিয়ে যাক। ঠান্ডা মাথায় পরীক্ষায় বসুক। ও নিশ্চয়ই এই বছর পাশ করবে। ওকে বোল, নিরাশ হওয়ার কিছু নেই।" মা বাড়ী ফিরে বাবার আশ্বাস ছেলেকে জানান। ও দিনরাত পরিশ্রম করে এবং পরীক্ষায় বসে। সব বিষয়েই খুব ভালো পরীক্ষা (লিখিত) দেয়। কিন্তু তবুও ওর মনে একটা সংশয় - বোধহয় পাশ করার মতন অতটা ভালো হয়নি। তাই ও ভাবল যে, মৌখিক পরীক্ষায় উপস্থিত হয়ে কোন লাভ হবে না। কিন্তু পরীক্ষক তো নাছোড়বান্দা। উনি এক বিদ্যার্থীকে দিয়ে বাবুকে বলে পাঠান যে, ওর লিখিত পরীক্ষা যথেষ্ট ভালো হয়েছে। এবার ওর মৌখিক পরীক্ষাতেও নিশ্চয়ই উপস্থিত থাকা উচিত। এই ভাবে উৎসাহ পেয়ে, বাবু পরীক্ষায় বসে এবং দুটি পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হয়। সেই বছর ওর গ্রহদশা প্রতিকূল হওয়া সত্ত্বেও, বাবার কৃপায় ও সফল হয়। এখানে শুধু এ কথাই মনে রাখা উচিত যে, **কষ্ট এবং সংশয়ের উৎপত্তি শেষে দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হয়। যেমন ভাবেই হোক পরীক্ষা তো হয়ই, কিন্তু আমরা যদি দৃঢ় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাপূর্বক চেষ্টা করে যাই, তাহলে সফলতা নিশ্চয়ই পাব।** এই ছেলেরই পিতা, রঘুনাথ রাও বম্বের এক বিদেশী ফার্মে চাকরী করতেন। উনি বেশ বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং নিজের কাজ ভালো ভাবে করতে পারতেন না। তাই উনি ছুটি নিয়ে বিশ্রাম করতে চাইতেন। ছুটি নেওয়া সত্ত্বেও ওঁর স্বাস্থ্যে কোন বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায় না। তাই এবার অবসর গ্রহণের কথা ভাবতে বাধ্য হতে হলো। একজন বিশ্বাসী কর্মচারী হওয়ার দরুণ প্রধান ম্যানেজার ওঁকে পেন্‌শন দিয়ে সেবানিবৃত্ত করা স্থির করেন।

পেন্‌শনে কত দেওয়া উচিৎ, সেটাই চিন্তা করা হচ্ছিল। উনি ১৫০ টাকা মাসিক বেতন পেতেন। সেই হিসেবে ওঁর পেন্‌শন হয় ৭৫ টাকা। কিন্তু সেটা ওঁর পরিবারের ভরণপোষণের জন্য পর্যাপ্ত ছিল না। নির্ণয় হওয়ার পনেরো দিন আগে, বাবা শ্রীমতি তেণ্ডুলকরকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বলেন- "আমার ইচ্ছে যে, তোমার স্বামীকে ১০০ টাকা পেন্‌শন দেওয়া হোক্। তুমি কি তাতে সন্তুষ্ট?"

শ্রীমতি তেন্ডুলকর উত্তর দেন- "বাবা, আপনার এই দাসীকে কেন জিজ্ঞাসা করছেন? আপনার শ্রীচরণেই আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস।"

যদিও বাবা ১০০ টাকা বলেছিলেন, কিন্তু সেটা বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনা করে ১০ টাকা বেশী অর্থাৎ ১১০ টাকা পেন্‌শন নিশ্চত হয়। বাবার নিজের ভক্তদের প্রতি ছিল অসীম স্নেহ ও ভালবাসা।

ক্যাপ্টেন হাটে ঃ-

ক্যাপ্টেন হাটে বাবার এক পরম ভক্ত ছিলেন। থাকতেন বিকানীরে। একবার স্বপ্নে বাবা ওঁকে জিজ্ঞাসা করেন- "তুমি কি আমায় ভুলে গেছো?" শ্রী হাটে তাঁর শ্রীচরণ ধরে বলেন- "ছেলে নিজের মাকে ভুলে কি বেঁচে থাকতে পারে?" এই বলে শ্রী হাটে তাড়াতাড়ি বাগানে গিয়ে, কিছু সীম ভেঙ্গে নিয়ে আসেন। একটা থালায় নৈবেদ্য সাজিয়ে তাতে দক্ষিণা রেখে, বাবাকে অর্পণ করতে যাবেন, এমন সময় ওঁর ঘুম ভেঙ্গে যায়। উনি বুঝতে পারেন যে- 'সেটা শুধু মাত্র একটা স্বপ্ন ছিল।' কিন্তু যে সব বস্তুগুলি উনি স্বপ্নে দেখেছিলেন, সেগুলি বাবার কাছে শিরডী পাঠাবেন স্থির করেন। কিছুদিন পর উনি গোয়ালিয়ার যান, এবং সেখান থেকে নিজের এক বন্ধুকে বারো টাকা 'মানি অর্ডার' পাঠিয়ে, চিঠিতে লিখে পাঠান- "দু'টাকার সিধেসামগ্রী

এবং সীম ইত্যাদি কিনে ও দশ টাকা দক্ষিণা রেখে, আমার হয়ে বাবাকে নিবেদন কোর।" ওর বন্ধু সবই জোগাড় করে নেন, কিন্তু সীম পেতে খুবই অসুবিধে হয়। এমন সময় উনি এক মহিলাকে মাথায় একটা টুকরী নিয়ে যেতে দেখেন। উনি এই দেখে খুবই আশ্চর্য্য হয়ে যান যে, ঐ টুকরীটিতে শুধু সীমই ছিল। তখন সীম কিনে, সব জিনিষগুলি নিয়ে মস্‌জিদে গিয়ে, শ্রী হাটের পাঠানো নৈবেদ্য বাবাকে অর্পণ করেন। পরের দিন শ্রী নিমোনকর তাই দিয়ে ভাত ও সীমের তরকারী বানিয়ে, বাবাকে খেতে দেন। সবার খুব আশ্চর্য্য লাগল যে, বাবা সেদিন শুধু সীমই খেলেন এবং অন্য জিনিষ স্পর্শও করলেন না। ওঁর বন্ধুর কাছে এই খবর পেয়ে, শ্রী হাটে গদগদ হয়ে ওঠেন এবং অগাধ আনন্দে মন ভরে ওঠে।

পবিত্র টাকা ঃ-

এক সময় ক্যাপ্টেন হাটের মনে হয় যে, একটা টাকা, বাবার পবিত্র করকমলে স্পর্শ করিয়ে, নিজের বাড়ীতে অবশ্যই রাখা উচিত। শিরডী যাবেন এমন এক বন্ধুর সাথে ওঁর হঠাৎ দেখা হয়। সে বন্ধুটিকে নিজের ইচ্ছেটি জানিয়ে, শ্রী হাটে তাঁকে একটা টাকা দেন। শিরডী পৌঁছে বন্ধুটি বাবাকে প্রণাম করার পর দক্ষিণা দেন, বাবা সেটি তক্ষুনি পকেটে রেখে নেন। এরপর উনি ক্যাপ্টেন হাটের টাকাটি অর্পণ করেন। বাবা সেটি হাতে নিয়ে খুব মন দিয়ে সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখতে থাকেন। টাকাটি নিজের বুড়ো আঙ্গুলের উপর রেখে উপর দিকে নিক্ষেপ করেন। এ রকম দু-চারবার করে টাকাটি বন্ধুটিকে দিয়ে বলেন- "উদীর সাথে এই টাকাটা নিজের বন্ধুকে ফিরিয়ে দিও। আমি ওঁর কাছ থেকে কিছু চাই না। ওঁকে বোল যে, উনি সুখে থাকুন, এই-ই আমি আশীর্বাদ করছি।" বন্ধুটি গোয়ালিয়ার ফিরে সেই

টাকাটি শ্রী হাটেকে দিয়ে, সেখানে যা-যা ঘটেছিল সে সব ওঁকে জানান। সে সব কথা শুনে, শ্রী হাটে খুব খুশী হন। উনি অনুভব করেন যে, বাবা সর্বদা ওঁর সদিচ্ছাগুলিকে উৎসাহিত করে, ওঁর সমস্ত মনোস্কামনা পূরণ করতেন।

৪) শ্রী বামন নার্বেকর ঃ-

পাঠকগণ! এবার অন্য একটা গল্প শুনুন। এক মহাশয়ের, নাম ওয়ামন নার্বেকর, সাই চরণে প্রগাঢ় প্রীতি ছিল। একবার উনি একটা এমন মুদ্রা আনেন, যার একদিকে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা এবং অপরদিকে করবদ্ধ মারুতির মূর্তি ছিল। উনি এই মুদ্রাটি বাবাকে এই ভেবে অর্পণ করেন যে, তিনি সেটি করস্পর্শ দ্বারা পবিত্র করে "উদী'-র সাথে ফিরিয়ে দেবেন। কিন্তু বাবা সেটা তক্ষুনি পকেটে রেখে নেন। শামা ওয়ামনরাও য়ের ইচ্ছেটি জানিয়ে, মুদ্রাটি ফিরিয়ে দিতে অনুরোধ করেন। তখন উনি ওয়ামনরাও-এর সামনেই বলেন- "এইটি ওঁকে ফেরত না দিয়ে, আমাদের কাছেই রাখব। যদি উনি এর বদলে পঁচিশ টাকা দিতে রাজী থাকেন, তাহলে আমি এটা ফিরিয়ে দেব।" মুদ্রাটি পাওয়ার জন্য, শ্রী ওয়ামনরাও পঁচিশ টাকা জোগাড় করে, বাবাকে দেন। তখন বাবা বলেন- "এই মুদ্রার মূল্য তো পঁচিশ টাকার থেকে অনেক বেশী। শামা, তুমি এটি নিজের ভাণ্ডারে জমা করে, নিজের দেবালয়ে প্রতিষ্ঠিত করে, এর নিত্য পূজো কোর।" কেউ সাহস করে জিজ্ঞাসা করতে পারে না যে, তিনি এমনটি কেন করলেন। এ তো শুধু বাবাই জানেন যে কার জন্য, কখন, কি উপযুক্ত।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

অধ্যায় - ৩০

শিরডীতে আনয়ন- ১) বণীর কাকা বৈদ্য ২) খুশালচন্দ ৩) বম্বের রামলাল পাঞ্জাবী।

এই অধ্যায়ে আরো তিনটি ভক্ত কিভাবে শিরডীর টানে সেখানে গিয়ে পৌঁছয়, সে কথাই বর্ণনা করা হয়েছে।

যিনি বিনা কোন কারণে ভক্তদের স্নেহ করেন, দয়ার সাগর এবং নির্গুন হয়েও ভক্তদের প্রেম পরবশ হয়ে, যিনি স্বেচ্ছায় মানব শরীর ধারণ করেছিলেন, যিনি এইরূপ ভক্তবৎসল যে, তাঁর দর্শন মাত্রেই ভবসাগরের ভয় ও সমস্ত কষ্ট দূর হয়ে যায়, সেই শ্রী সাইনাথ মহারাজকে আমরা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাই। ভক্তদের আত্মদর্শন করানোই সন্তদের প্রধান কাজ। সন্ত শিরোমণি শ্রী সাইয়ের ছিল এটাই মুখ্য উদ্দেশ্য। যারা তাঁর শ্রী চরণের শরণে যায়, তাদের সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে, দিন-দিন উন্নতি হতে থাকে। তাঁর শ্রীচরণ স্মরণ করে পবিত্র স্থান থেকে ব্রাহ্মণেরা শিরডীতে আসত এবং তাঁর কাছে বসে শাস্ত্র পাঠ করত, গায়ত্রী মন্ত্রের জপ করত। কিন্তু **যারা নির্বল এবং সর্বপ্রকারে দীন-হীন এবং যারা এও জানে না যে ভক্তি কাকে বলে, তাদের শুধু একটাই বিশ্বাস যে, সবাই ওদের অসহায় জেনে উপেক্ষা করতে পারে- কিন্তু অনাথের নাথ এবং প্রভু শ্রীসাই ওদের কখনো পরিত্যাগ করবেন না।** যার উপর তিনি কৃপা করেন, সে প্রচণ্ড শক্তি, নিত্যানিত্যে বিবেক ও জ্ঞান সহজেই লাভ করে।

তিনি নিজের ভক্তদের ইচ্ছে জেনে সেটি পূরণ করেন। তাই ভক্তদের মনোবাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হয় এবং তারা কৃতজ্ঞ হয়ে থাকে। আমরা তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে প্রার্থনা করছি যে- **"হে সাই, আমাদের ভুল-ত্রুটির দিকে মন না দিয়ে আমাদের সমস্ত কষ্ট থেকে বাঁচিয়ে নাও।"** যে বিপদগ্রস্ত প্রাণী এই ভাবে শ্রী সাইয়ের কাছে প্রার্থনা করে, তাঁর কৃপায় সে পূর্ণ শান্তি ও সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করে। শ্রী হেমাডপন্ত বলেন যে- "হে, আমার সাই। তুমি তো দয়ার সাগর। এ তো তোমারই দয়ার ফল যে, আজ এই 'সাই সৎচরিত্র' ভক্তদের হাতে পৌঁছতে পেরেছে। নতুবা আমার সেই যোগ্যতা কোথায় যে, এমন কঠিন কাজ হাতে নেওয়ার দুঃসাহস করতে পারি? যখন সম্পূর্ণ দায়িত্ব তুমি নিজের উপরই নিয়ে নিয়েছ, তখন আমার তিলমাত্র ভার অনুভব হচ্ছে না। আমার আর কোন চিন্তা নেই।" শ্রীসাই এই গ্রন্থের রূপে, শ্রী হেমাডপন্তের সেবা স্বীকার করেন। এটি শুধু ওঁর পূর্ব জন্মের শুভ সংস্কারের জন্যই সম্ভব হতে পেরেছে। তাই উনি নিজেকে ভাগ্যবান ও কৃতার্থ মনে করেন।

নীচে লেখা ঘটনা কপোলকল্পিত নয়, বরং বিশুদ্ধ অমৃত। এটি যে হৃদয়ঙ্গম করবে, সে শ্রী সাইয়ের মহানতা ও সর্বব্যাপকতা সহজেই জানতে পারবে। কিন্তু যে যুক্তি-তর্ক বা সমালোচনা করতে ইচ্ছুক, তার এই কথাগুলির দিকে কান দেওয়ার দরকার নেই। এখানে তর্ক নয়, বরং প্রগাঢ় প্রেম ও ভক্তির প্রয়োজন। বিদ্বান, ভক্তিমান, গভীরভাবে বিশ্বাসী যাঁরা বা যাঁরা নিজেদের সাই পদ সেবক মনে করেন, তাঁদেরই এই কথাগুলি রুচিকর ও শিক্ষাপ্রদ মনে হবে। অন্য লোকেদের জন্য তো এগুলি কেবল কপোল কল্পনা। শ্রী সাইয়ের অন্তরঙ্গ ভক্তদের শ্রীসাই লীলাগুলি কল্পতরুর মতন মনে

হবে। শ্রীসাই লীলারূপী অমৃত পান করলে অজ্ঞান জীবেরা মোক্ষ, গৃহস্থরা শান্তি এবং মুমুক্ষুজন সাধনার এক সর্বোচ্চ পথ লাভ করবেন। এবার আমরা এই অধ্যায়ের মূল কথায় আসব।

কাকাজী বৈদ্য ঃ-

নাসিক জেলার বণী গ্রামে কাকাজী বৈদ্য নামে এক ব্যক্তি থাকতেন। উনি সপ্তশ্রৃঙ্গী দেবীর প্রধান পুরোহিত ছিলেন। একবার উনি এমন বিপদে পড়েন যে, মনের শান্তি হারিয়ে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। একদিন উনি দেবীর মন্দিরে গিয়ে, অন্তঃকরণ হতে প্রার্থনা করেন যে "হে দেবী, হে দয়াময়ী! আমায় এই কষ্ট থেকে শীঘ্র মুক্ত করো।" ওঁর প্রার্থনায় দেবী প্রসন্ন হন এবং ঐ রাত্রিতেই ওঁকে স্বপ্নে বলেন- "তুই বাবার কাছে যা। ওখানে তোর মন শান্ত ও স্থির হয়ে যাবে।" বাবার পরিচয় জানবার জন্য কাকাজী অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন, কিন্তু দেবীকে প্রশ্ন করার আগেই ওঁর ঘুম ভেঙ্গে যায়। এবার উনি বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েন- ইনি কোন বাবা, যাঁর দিকে দেবী ইঙ্গিত করছেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর, তাঁর মনে হলো যে, সম্ভবতঃ দেবী ত্রয়্যম্বকেশ্বর বাবার (শিব) কথা বলেছেন। তাই উনি পবিত্র তীর্থ ত্রয়্যম্বক (নাসিক) গিয়ে দশ দিন থাকেন। সকাল-সকাল উঠে, স্নান ইত্যাদি সেরে, রুদ্র মন্ত্রের জপ করতেন। কিন্তু তাতেও মনের অশান্তি দূর হয় না। তখন উনি বাড়ী ফিরে আবার অতি করুণ স্বরে দেবীর স্তুতি করেন। সেই রাত্রিতে দেবী ওঁকে স্বপ্নে আবার দর্শন দিয়ে বলেন- "তুই মিছিমিছি ত্রয়্যম্বকেশ্বর গেলি। বাবা বলতে, আমি শিরডীর শ্রীসাই বাবার কথা বলেছিলাম।" এবার কাকাজীর প্রধান চিন্তা হল যে, কি করে এবং কখন শিরডী গিয়ে বাবার শ্রীদর্শন করা যেতে পারে।

যথার্থে যদি কোন ব্যক্তি কোন সন্তের দর্শন হেতু আকুল হয়ে ওঠে, তাহলে শুধুমাত্র সেই সন্তই নয়, ভগবানও তার ইচ্ছে পূরণ করেন। প্রকৃতপক্ষে সন্ত ও অনন্ত একই এবং তাঁদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যদি কেউ মনে করে যে সে নিজে গিয়েই সন্তের সঙ্গে দেখা করবে, তাহলে সেটা হবে একটা দম্ভ। **সন্তের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, কে তাঁর দর্শন করতে পারে?** তাঁর ইচ্ছে ছাড়া গাছের একটা পাতাও নড়তে পারে না। **সন্ত দর্শনের উৎকণ্ঠা যত তীব্র হয়, সেই অনুপাতেই ভক্তি ও বিশ্বাস বাড়ে, এবং ততই তাড়াতাড়ি মনোস্কামনা পূর্ণ হয়।** যে নিমন্ত্রণ দেয়, অতিথি সৎকারের ব্যবস্থাও সে-ই করে। কাকাজীর ক্ষেত্রেও ঠিক এমনি হল।

শামার বিশ্বাস ঃ-

যে সময় কাকাজী শিরডী যাত্রার কথা মনে-মনে স্থির করেছিলেন, সেই সময়ই ওঁর বাড়ীতে এক অতিথি (শামা) এসে পৌঁছন। উনি ঠিক এই সময়ে বণীতে কেন এবং কি করে এসে পৌঁছান, সেটাও এক আশ্চর্য্য। ছোটবেলায় উনি একবার খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। ওঁর মা, নিজের কুলদেবী সপ্তশ্রৃঙ্গীর কাছে প্রার্থনা করেন- "যদি আমার ছেলে সুস্থ হয়ে ওঠে, তাহলে আমি তাকে তোমার চরণে নিয়ে আসব।" আবার কয়েক বছর পর শামার মায়ের বুকে দাদ হয়। তখন উনি আর একবার দেবীর কাছে প্রার্থনা করেন- "যদি আমি রোগমুক্ত হয়ে যাই, তাহলে তোমায় দুটো রূপোর স্তন অর্পণ করব।" কিন্তু এই দুটি মান্‌সিকই অপূর্ণ রয়ে যায়। মৃত্যুর আগে,

শামাকে কাছে ডেকে, ওঁর মা ঐ দুটি মান্‌সিক মনে করিয়ে, সেগুলি পূর্ণ করার আশ্বাস পেয়ে প্রাণত্যাগ করেন। কিছুদিন পর শামা নিজের প্রতিজ্ঞার কথা একেবারেই ভুলে যান, এবং এই ভাবে ৩০ বছর কেটে যায়। এক সময় এক বিখ্যাত জ্যোতিষী শিরডী এসে, সেখানে প্রায় মাস খানেক ছিলেন। শ্রীমান বুটী সাহেব এবং অন্য লোকেদের যা-যা ভবিষ্যবাণী করেছিলেন সেগুলি প্রায়-প্রায় ঠিক প্রমাণিত হয় । তাই সবাই খুব সন্তুষ্ট হয়। শামার ছোট ভাই বাপাজীও ওঁকে কয়েকটা প্রশ্ন করেন। তাতে উনি জানান- "তোমার বড় ভাই নিজের মাকে মৃত্যুশয্যায় যে কথা দিয়েছিলেন, সেগুলি এখনো পূরণ না হওয়ায় দেবী অসন্তুষ্ট হয়ে ওঁকে কষ্ট দিচ্ছেন।" জ্যোতিষীর কথা শুনে শামার নিজের প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়ে। দেরী করা বিপজ্জনক হতে পারে ভেবে, উনি তাড়াতাড়ি দু'টি রূপোর স্তন তৈরী করিয়ে, সেগুলি মস্‌জিদে নিয়ে গিয়ে বাবার সামনে রাখেন। বাবাকে প্রণাম করে সেগুলি গ্রহণ করে তাঁকে বচনমুক্ত করতে প্রার্থনা করেন। শামা বলেন- "আমার জন্য ত মা সপ্তশৃঙ্গী আপনিই।" কিন্তু বাবা তাতে বলেন- "তুমি স্বয়ং এগুলি নিয়ে গিয়ে দেবীর চরণে অর্পণ করো।" বাবার অনুমতি ও উদী নিয়ে, উনি বণীর উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেন। পুরোহিতের খোঁজ করতে-করতে, উনি কাকাজীর বাড়ী এসে পৌছান। কাকাজী এই সময় বাবার দর্শন করার জন্য খুবই অস্থির হয়ে উঠেছিলেন, এবং ঠিক এমনি সময়, শামা সেখানে এসে পৌছান। এ কি চমৎকার যোগাযোগ! আগন্তুকের পরিচয় পেয়ে এবং তিনি যে শিরডী থেকে এসেছেন শুনে, কাকাজী শামাকে একেবারে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর দুজনের মধ্যে সাইয়ের লীলা সম্বন্ধে গল্প শুরু হল। শামা নিজের প্রতিজ্ঞা-কৃত্য পূরণ করে কাকাজীর সাথে

শিরডী ফিরে যান। কাকাজী মস্‌জিদে পৌঁছে বাবার পায়ে লুটিয়ে পড়েন। ওঁর দু-চোখ থেকে প্রেমাশ্রুর ধারা বইতে থাকে এবং মন স্থির হয়ে যায়। দেবীর দৃষ্টান্ত অনুসারে, বাবার দর্শন করা মাত্রে কাকাজীর মনের অশান্তি নষ্ট হয়ে যায় এবং উনি পরম শান্তি অনুভব করেন। উনি আশ্চর্যান্বিত বোধ করছিলেন- এ কি অদ্ভুত শক্তি যে, কোন সম্ভাষণ বা প্রশ্নোত্তর না করেই বা কোনরকম আশিস না পেয়েই, শুধুমাত্র দর্শনেই, অপার প্রসন্নতা বোধ হচ্ছে ! সত্যি দর্শনের মাহাত্ম্য তো একেই বলে। ওঁর তৃষিত দৃষ্টি সাই চরণেই নিবদ্ধ হয়ে যায় এবং উনি মুখ থেকে একটা কথাও বলতে পারেন না। বাবার অন্যান্য লীলা শুনে, ওঁর খুবই আনন্দ হয়। উনি চিন্তা-ভাবনা ভুলে, বাবার পদতলে নিজেকে সম্পূর্ণ সঁপে দিলেন। শিরডীতে বারো দিন সুখে কাটিয়ে, বাবার অনুমতি, আশীর্বাদ ও উদী প্রাপ্ত করে উনি নিজের বাড়ী ফিরে আসেন।

খুশালচন্দ (রাহাতা নিবাসী) ঃ-

প্রায় দেখা গেছে যে, ভোরবেলায় যে স্বপ্ন দেখা হয়, সেটা জাগ্রত অবস্থায় সত্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু বাবার ক্ষেত্রে সময়ের কোন এরকম বাধ্যবাধকতা ছিল না। তারই এক উদাহরণ এখানে দেওয়া হচ্ছে। বাবা একদিন তৃতীয় প্রহরে কাকাসাহেবকে টাঙ্গায় রাহাতা গিয়ে খুশালচন্দকে নিয়ে আসতে বলেন। খুশালচন্দের সাথে ওঁর অনেকদিন দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। রাহাতা পৌঁছে কাকাসাহেব খুশালচন্দকে এই খবরটি দেন। কথাটি শুনে খুশালচন্দ অবাক হয়ে বলেন- "দুপুরে খাবার পর আমি কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে পড়ি। সেই সময় বাবা স্বপ্নে দেখা দিয়ে, তক্ষুনি শিরডী আসতে বলেন। কিন্তু ঘোড়ার কোনরকম ব্যবস্থা না থাকার দরুণ আমি আমার ছেলেকে

তাঁর কাছে পাঠাই, এই খবরটা দিতে। ও যখন গ্রামের সীমানায় পৌঁছায়, তখনই সামনে দিয়ে টাঙ্গায় আপনাকে আসতে দেখে।" এরপর ওঁরা দুজন ঐ টাঙ্গাতেই শিরডী রওনা হন। বাবার সাথে দেখা করে উনি খুব খুশী হন এবং বাবার এই লীলা দেখে খুশালচন্দ মুগ্ধ হয়ে যান।

বম্বের রামলাল পাঞ্জাবী ঃ-

বম্বের এক পাঞ্জাবী ব্রাহ্মণ শ্রী রামলালকে বাবা স্বপ্নে এক মোহান্তর (সাধু) বেশে দর্শন দিয়ে শিরডী আসতে বলেন। কিন্তু রামলাল এই মোহান্ত সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। শ্রীদর্শনের তীব্র উৎকণ্ঠা তো ছিল, কিন্তু ঠিকানা না জানার দরুণ, উনি বড়ই মুস্কিলে পড়ে যান। যে নিমন্ত্রণ দেয়, সে আসবার ব্যবস্থাও করে রাখে এবং শেষে হলোও তাই। ঐ দিনই সন্ধ্যাবেলায় বেড়াবার সময়, একটা দোকানে রামলাল বাবার একটি ছবি দেখতে পান। স্বপ্নে যে সাধুর দর্শন হয়েছিল, তাঁর আর এই ছবিটির মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল। জিজ্ঞাসাবাদ করার পর জানতে পারেন যে, এই ছবিটি শিরডীর শ্রী সাইবাবার। উনি শীঘ্রই শিরডী অভিমুখে রওনা হয়ে যান, এবং আজীবন সেখানেই থাকেন।

এই ভাবে বাবা নিজের ভক্তদের দর্শনের জন্য শিরডী ডাকতেন এবং তাদের লৌকিক ও পারলৌকিক সমস্ত ইচ্ছে পূরণ করতেন।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

অধ্যায় - ৩১

মুক্তি দান

১) সন্ন্যাসী বিজয়ানন্দ ২) বালারাম মানকর ৩) নুলকর ৪) মেঘা ৫) একটি বাঘ।

বাবার সামনে কয়েকটি ভক্তের মৃত্যু ও বাঘের প্রাণত্যাগের কথা হেমাডপন্ত এই অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

প্রারম্ভ ঃ-

মৃত্যুর সময় মনে যা শেষ ইচ্ছে বা ভাবনা জাগে, সেটিই মরণোত্তর পরিণতি স্থির করে। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় (অধ্যায় ৮) বলেছেন "নিজের জীবনের শেষ সময় আমায় যে স্মরণ করে, সে আমাকেই প্রাপ্ত করে এবং সেই সময় সে যা দৃশ্য দেখে, সেটাই সে লাভ করে।" এটি কেউই হলফ্ করে বলতে পারে না যে, সেই সময় আমাদের মনে উত্তম বিচারই জাগবে। বরং এমন মনে হয় যে, মৃত্যু আসন্ন দেখে নানা কারণে ভয়ভীত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী থাকে। তাই মনকে কোন উত্তম বিচারের চিন্তনে লাগিয়ে রাখার নিত্যাভ্যাস অত্যন্ত আবশ্যক। সব সাধু-সন্তরা হরি নাম ও তার জপকেই শ্রেষ্ঠ বলেন- যাতে মৃত্যুর সময় আমরা কোন সাংসারিক সমস্যায় না জড়িয়ে পড়ি। ভক্তরাও সম্পূর্ণ ভাবে সন্তদের শরণাপন্ন হয়, যাতে তাঁরা উচিত পথপ্রদর্শন করে তাদের সাহায্য করেন। এই কথারই কিছু উদাহরণ নীচে দেওয়া হচ্ছে -

১) বিজয়ানন্দ ঃ-

এক মাদ্রাজী সন্ন্যাসী বিজয়ানন্দ মানসরোবরের যাত্রায় বেরোন। পথে বাবার কীর্তির কথা শুনে, উনি শিরডী আসেন এবং সেখানে হরি দ্বারের সোমদেবজী স্বামীর সাথে ওঁর দেখা হয়। স্বামীজীকে মানসরোবরের যাত্রা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করায় স্বামীজী জানান যে, মানসরোবর গঙ্গোত্রী থেকে প্রায় ৫০০ মাইল উত্তরের দিকে পড়ে। রাস্তায় যে-যে অসুবিধে ও কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়, তাও উল্লেখ করেন। বরফে ঢাকা রাস্তা, ৫০ ক্রোশ পরপর ভাষার ভিন্নতা, এবং স্থানীয়বাসিন্দাদের সন্দিগ্ধ স্বভাব, যারা তীর্থযাত্রীদের নানারকম অসুবিধা ও হয়রানি করে, ইত্যাদি। একথা শুনে, সন্ন্যাসীর মন উদাস হয়ে যায়, এবং উনি যাত্রার পরিকল্পনা ছেড়ে মস্‌জিদে গিয়ে বাবার শ্রীচরণ স্পর্শ করেন। বাবা রেগে ওঠে বলেন- "এই অপদার্থ সন্ন্যাসীকে এখান থেকে বার করে দাও। এর সঙ্গ করাও বৃথা।" সন্ন্যাসী বাবার স্বভাবের বিষয়ে একবারেই অপরিচিত ছিলেন। উনি বড়ই হতাশ হয়ে পড়েন- এক কোণে চুপচাপ বসে, শুধু মস্‌জিদে লোকেদের গতিবিধি দেখছিলেন। সকালবেলা দরবারে ভক্তদের বেজায় ভীড়। বাবার যথাবিধি অভিষেক করা হচ্ছিল। কেউ তাঁর পা ধুইয়ে দিচ্ছে, কেউ তাঁর চরণামৃত পান করছে, বা চোখে লাগাচ্ছে। কেউ-কেউ তাঁকে চন্দন ও আতরও লাগাচ্ছিল। জাত-পাতের পার্থক্য ভুলে, সবাই বাবার সেবায় মগ্ন ছিল। যদিও বাবা সন্ন্যাসীর উপর রেগে গিয়েছিলেন, তবুও সন্ন্যাসীর মন বাবার প্রতি গভীর প্রীতিতে ভরে ওঠে। ওঁর সেই স্থান ছেড়ে যেতে, একটুও ইচ্ছে করছিল না। এর দুদিন পরই মাদ্রাজ থেকে চিঠি আসে যে, ওঁর মায়ের অবস্থা চিন্তাজনক। এই খবর পেয়ে সন্ন্যাসী খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন এবং

মায়ের সঙ্গে দেখা করার ভীষণ ইচ্ছে হয়। কিন্তু বাবার অনুমতি না নিয়ে উনি শিরডী থেকে যেতেই বা কি করে পারতেন? তাই হাতে চিঠিটা নিয়ে, উনি বাবার কাছে যান এবং বাড়ী ফেরার অনুমতি চান। ত্রিকালদর্শী বাবা তো সবার ভবিষ্যত জানতেন। তিনি বলেন- "মায়ের প্রতি এত মোহ আছে তো, সন্ন্যাস ধারণ করার কি দরকার ছিল? মমতা বা মোহ, গেরুয়া বস্ত্রধারীদের কি শোভা দেয়? যাও, চুপচাপ নিজের জায়গায় গিয়ে, কিছুদিন শান্তিতে কাটাও। কিন্তু সাবধান! 'ওয়াড়ায়' অনেক চোর আছে। তাই দরজা বন্ধ করে সাবধানে থেকো, নাহলে চোর সব চুরি করে নিয়ে যাবে। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সমস্ত পদার্থের মোহ ত্যাগ করে, নিজের কর্তব্য করো। যে এই ধরনের আচরণ করে শ্রীহরির শরণে যায়, সে সব কষ্ট হতে মুক্ত হয়ে, পরমানন্দ লাভ করে। **যে পরমাত্মার ধ্যান ও চিন্তন, প্রেম ও ভক্তি সহকারে করে, পরমাত্মা তার সাহায্য অবশ্যই করেন।** পূর্বজন্মের শুভ সংস্কারের ফলস্বরূপই, তুমি এখানে এসে পৌঁছেছ এবং আমি যা-যা বলছি, সেটা মন দিয়ে শোন। নিজের জীবনের মুখ্য লক্ষ্যের বিষয়ে চিন্তা করো। ইচ্ছারহিত হয়ে, কাল থেকে তিন সপ্তাহ অবধি ভাগবৎ পাঠ করো। তখন ভগবান প্রসন্ন হবেন এবং তোমার সব দুঃখ দূর করে দেবেন। মায়ার আবরণ দূর হলে, তুমি শান্তি পাবে।" ওঁর শেষ সময় আসন্ন জেনে বাবা ওকে এই উপায়টি বলেন। এরই সাথে 'রামবিজয়' পড়বারও আদেশ দেন, যাতে যমরাজ বেশী খুশী হন। পরের দিন স্নানাদি ও অন্যান্য শুদ্ধি কৃত্য সেরে, সন্ন্যাসী 'লেণ্ডীবাগে' একান্তে বসে, ভাগবৎ পাঠ শুরু করেন। দ্বিতীয় বার পাঠ শেষ হওয়ার পর, উনি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং 'ওয়াড়া'য় এসে দু দিন বিশ্রাম করেন। তৃতীয় দিন বাবার

কোলে উনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দর্শনের জন্য বাবা ওঁর শরীর একদিন ওখানে রাখতে বলেন। তারপর পুলিশ এসে যথোচিত তদন্ত করার পর, মৃতদেহ সরাবার অনুমতি দেয়। যথোপযুক্ত স্থানে আনুষ্ঠানিক ভাবে তাকে সমাধি দেওয়া হল। বাবা এই ভাবে সন্ন্যাসীকে সাহায্য করে তাঁকে সদ্‌গতি প্রদান করেন।

২) বালারাম মানকর ঃ-

বালারাম মানকর নামে এক গৃহস্থ বাবার পরম ভক্ত ছিলেন। ওঁর স্ত্রীর স্বর্গবাস হওয়ায় উনি বড় নিরাশ হয়ে ঘর-সংসারের দায়িত্ব ছেলেকে দিয়ে নিজে শিরডীতে এসে বাবার কাছে থাকতে শুরু করেন। ওঁর ভক্তি দেখে, বাবা ওঁর জীবনের গতি পরিবর্তন করতে চাইতেন। তাই উনি বালারামের হাতে বারোটা টাকা দিয়ে, মছিন্দ্রগড়ে (জেলা সাতারা) গিয়ে থাকতে বলেন। বাবার সান্নিধ্য ছেড়ে অন্যত্র কোথাও গিয়ে থাকার ইচ্ছে মানকরের ছিল না। কিন্তু বাবা ওঁকে বুঝিয়ে বলেন- "তোমার মঙ্গলের জন্যই আমি এই সর্ব্বোত্তম উপায় তোমায় বলছি। ওখানে গিয়ে, দিনে তিনবার ভগবানের ধ্যান কোর।" বাবার কথায় বিশ্বাস রেখে, উনি মচ্ছিন্দ্রগঢ়ে যান। সেখানকার মনোহর পরিবেশে, শীতল জলে এবং স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় ওঁর মন প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। বাবার আদেশ অনুসারেই উনি ভগবানের ধ্যান করা শুরু করেন এবং কিছুদিন পরই দর্শন পান। বেশীর ভাগ সময় ভক্তরা সমাধি অবস্থায় দর্শন পায়। মানকর সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় তাঁর দর্শন পান। দর্শন হওয়ার পর, মানকর বাবাকে ওঁকে সেখানে পাঠাবার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করেন। তাতে বাবা বলেন- "শিরডীতে তোমার মনে নানারকম বিচারধারা চলছিল। তাই আমি তোমায় এখানে পাঠাই, যাতে তোমার চঞ্চল মন শান্ত হতে পারে। তোমার ধারণা ছিল যে,

আমি শুধু শিরডীতেই আছি এবং সাড়ে তিন হাতের এক পাঁচ তত্ত্বের পুতুল ছাড়া আর কিছুই নই। এবার আমার দর্শন করে, এটা যাচাই করে নাও যে যাঁকে তুমি শিরডীতে দেখেছিলে এবং যাঁর দর্শন তুমি এখানে করলে, তাঁরা দুজনে অভিন্ন কি না।" মানকর সেখান থেকে বান্দ্রায় নিজের বাড়ী ফিরে যান। উনি পুণে থেকে দাদার, ট্রেনে যেতে চাইছিলেন। টিকিট কিনতে গিয়ে, সেখানে খুব বেশী ভিড় দেখে পিছিয়ে যান। এমন সময় একটি গ্রাম্য লোক, যার কাঁধে একটা কম্বল এবং শরীরে একটা ল্যাঙোট ছাড়া কিছুই ছিল না, মানকরকে এসে জিজ্ঞাসা করে- "আপনি কোথায় যাচ্ছেন?" মানকর জবাব দেন- "দাদার।" তখন লোকটি বলে- "আমার এই দাদারের টিকিটটা আপনি রাখুন, এখানে একটা দরকারী কাজ এসে পড়ায়, আমি আজ যেতে পারছি না।" টিকিট পেয়ে মানকর তো অতিশয় খুশী। পকেট থেকে টাকা বার করতে-করতেই, সেই লোকটি ভিড়ের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়। মানকর অনেক খোঁজা-খুঁজি করেন, কিন্তু তার কোন ফল হয় না। গাড়ী ছাড়া পর্যন্ত, মানকর সেই লোকটির জন্য প্রতীক্ষা করেন, কিন্তু সে আর ফিরে আসে না। এই ভাবে মানকর বিচিত্র রূপে, বাবার দ্বিতীয় বার দর্শন পান। কিছু দিন নিজের বাড়ীতে থেকে, মানকর আবার শিরডী ফিরে আসেন এবং বাবার শ্রীচরণেই দিন কাটাতে শুরু করেন। এখন তিনি সর্বদা বাবার আদেশ পালন করতেন। শেষে এই ভাগ্যবান ব্যক্তি বাবার সামনে, তাঁর আশীর্বাদ প্রাপ্ত করে প্রাণত্যাগ করেন।

৩) তাত্‌য়া সাহেব নুলকর ঃ-

হেমাডপন্ত তাত্‌য়া সাহেব নুলকরের বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ লেখেননি।

শুধু এতটাই লিখেছিলেন যে উনি শিরডীতে দেহত্যাগ করেন। ১৯০৯ সালে যে সময় তাত্য়া সাহেব পন্ঢরপুরে উপন্যায়াধীশ ছিলেন, সেই সময়ই নানাসাহেব চাঁদোরকরও ওখানকার মাম্লৎদার ছিলেন। এঁরা দুজনে প্রায় দেখা-সাক্ষাৎ ও গল্প-গুজব করতেন। তাত্য়া সাহেবের সাধু সন্তে, সে রকম বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু নানাসাহেব ওঁকে সাইবাবার লীলা শোনাতেন এবং একবার শিরডী গিয়ে বাবার দর্শন করার জন্য অনুরোধ করেন। উনি দুটি শর্তে শিরডী যেতে রাজী হন - ১) একজন ব্রাহ্মণ রাঁধুনি পাওয়া চাই ২) উপহার দেওয়ার জন্য নাগপুরের ভালো কমলালেবু পাওয়া চাই। খুব শীঘ্র, ওঁর এই দু'টি শর্তই পূরণ হয়ে পড়ে। নানাসাহেবের কাছে একটি ব্রাহ্মণ চাকরীর খোঁজে আসে, যাকে উনি তাত্য়া সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দেন। একটা কমলালেবুর পার্শেলও এসে পৌঁছয়। কিন্তু তার উপর প্রেরণকারীর নাম বা ঠিকানা লেখা ছিল না। শর্ত পূরণ হওয়ার পর ওঁকে শিরডী যেতেই হয়। প্রথমে, বাবা ওঁর উপর রেগে ওঠেন। ধীরে-ধীরে, যখন তাত্য়াসাহেবের বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে, বাবা সত্যি সত্যি ঈশ্বরাবতার, তখন উনি বাবার শরণাপন্ন হন। তারপর শেষ জীবন অবধি, সেখানেই তাকেন। ওঁর শেষ সময় নিকটস্থ জেনে, ওঁকে পবিত্র ধর্মকথা শোনানো হয়েছিল। শেষ সময়ে বাবার চরণামৃত দেওয়া হয়েছিল। ওঁর মৃত্যুসংবাদ শুনে বাবা বলে ওঠেন- "আরে! তাত্য়া তো আগেই চলে গেল। ওর আর পুনর্জন্ম হবে না।

৪) মেঘা ঃ-

অধ্যায় ২৮-তে মেঘার কথা বলা হয়েছে। মেঘার মৃতদেহের সাথে সব গ্রামবাসীরা শ্মশান পর্যন্ত যায়। বাবাও তাদের মধ্যে সম্মিলিত

হন, এবং মৃত শরীরের উপর ফুল ছড়ান। দাহ-সংস্কারের পর বাবার চোখ থেকে অশ্রুধারা বইতে দেখা যায়। একজন সাধারণ মানুষের মত তাঁর হৃদয়ও দুঃখে বিদীর্ণ হয়। শরীরটি ফুল দিয়ে ঢেকে, এক নিকট আত্মীয়ের মত কাঁদতে-কাঁদতে, বাবা মস্জিদে ফিরে আসেন। সদ্গতি প্রদান করতে অনেক সন্তদেরই দেখেছি, কিন্তু বাবার মহানতা অদ্বিতীয়। এমন কি বাঘের মত হিংস্র পশুও, নিজের রক্ষার জন্য, বাবার শরণে আসে। এবার সেটাই বর্ণনা করা হবে।

৫) বাঘের মুক্তি ঃ-

বাবার সমাধিস্থ হওয়ার সাতদিন আগে, একটি বিচিত্র ঘটনা ঘটে। মস্জিদের সামনে একটা গরুর গাড়ী এসে দাঁড়ায়। তার মধ্যে একটা বাঘ বাঁধা ছিল। ওর ভয়ানক মুখটা গাড়ীর পিছনের দিকে ছিল। বাঘটা কোন একটা অজ্ঞাত কষ্টে ভুগছিল। বাঘের মালিক তিনজন দরবেশ এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে গিয়ে ওর প্রদর্শন করত এবং এই ভাবে যথেষ্ট অর্থোপার্জন করত। তাদের ঐ ছিল জীবিকা। ওরা বাঘটির চিকিৎসার সবরকম চেষ্টা করে, কিন্তু সব কিছু ব্যর্থ হয়। শেষে কোন এক জায়গায়, ওরা বাবার কীর্তির কথা শুনে, বাঘটিকে নিয়ে বাবার দরবারে আসে। হাতে শিকল ধরে, ওরা বাঘটিকে মস্জিদের দরজায় দাঁড় করিয়ে দেয়। বাঘটি ছিল রোগাক্রান্ত, ক্রুদ্ধ ও অস্থির। সবাই ভয় ও আশ্চর্য্যের দৃষ্টিতে, ওর দিকে তাকিয়েছিল। ওরা তিনজন ভেতরে গিয়ে বাবাকে সব কথা জানিয়ে এবং তাঁর অনুমতি নিয়ে বাঘটিকে বাবার সামনে নিয়ে যায়। সিঁড়ির কাছে পৌঁছেই, বাবার তেজঃপুঞ্জ স্বরূপ দর্শন করে, বাঘটি পেছনে সরে গিয়ে মাথা নীচু করে নেয়। পরে দুজনের চোখাচুখি হতেই বাঘটি

সিঁড়ির উপর চড়ে গিয়ে, বাবাকে প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখতে থাকে। লেজ নাড়িয়ে তিনবার মাটিতে ঝাপটায় এবং সঙ্গে-সঙ্গে প্রাণত্যাগ করে। ওকে মৃত দেখে, তিনজন দরবেশ অত্যন্ত নিরাশ ও দুঃখী হয়। কিছুক্ষণ পর ওদের বোধ হয় যে, প্রাণীটা রোগগ্রস্ত তো ছিলই এবং ওর আয়ু ফুরিয়ে এসেছিল। যাক্, ওর জন্য ভালই হলো যে, বাবার মত সন্তের চরণে সদ্‌গতি পেলো। বাঘটি ওদের কাছে ঋণী ছিল এবং ঋণ শোধ হতেই ও মুক্ত হয়ে সাই চরণে সদ্‌গতি পেয়ে গেল। **যদি কোন প্রাণী কোন সন্তের চরণে মাথা রেখে প্রাণত্যাগ করে, তাহলে তার মুক্তি লাভ হয়।** পূর্ব জন্মের শুভ সংস্কার না থাকলে, এরকম সুন্দর পরিসমাপ্তি কি করে সম্ভব হতে পারে?

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

অধ্যায় - ৩২

গুরু ও ঈশ্বরের খোঁজ, উপবাস অমান্য, বাবার 'সরকার'।

এই অধ্যায়ে হেমাডপন্ত দুটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন- **১)** বাবার নিজের গুরুর সাথে কিভাবে দেখা হয় এবং তাঁর কৃপায় ঈশ্বর দর্শন কিভাবে লাভ হয়? **২)** শ্রীমতি গোখলেকে, যিনি তিনদিন ধরে উপবাস করছিলেন, 'পুরণপোলী' খাওয়ান।

প্রস্তাবনা ঃ-

শ্রী হেমাডপন্ত অশ্বথ গাছের উপমা দিয়ে, এই দৃষ্টিগোচর সংসারের স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। তার জড় উপরের দিকে ও শাখাগুলি নীচের দিকে ছড়িয়ে আছে। "উর্দ্ধমূলমধঃশাখম্" (গীতা **১৫** অধ্যায়, শ্লোক **১**)। সেই রকমই সংসারের মূল থাকে উপরে অর্থাৎ মায়াশক্তি বিশিষ্ট ব্রহ্মে। শাখা-প্রশাখা রূপী কর্মকাণ্ড, মানুষের জন্য নিচের দিকে বিস্তৃত হয়। ত্রিগুণের (সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণের) দ্বারা সেই কর্মকাণ্ড পুষ্টি লাভ করে ও তার মূলগুলি ইন্দ্রিয়ের কাম্য পদার্থ। কর্মরূপী জড়গুলি সৃষ্টির মানবের দিকে ছড়িয়ে আছে। এই গাছটিকে বড় বিচিত্র রূপে রচনা করা হয়েছে। এর আকার, উদ্‌গম ও শেষের কোন হদিশ পাওয়া যায় না। আর নাই বোঝা যায় এর আধার। এই কঠোর জড়ের সংসাররূপী বৃক্ষকে নষ্ট করার জন্য কোন বাহ্য মার্গ অবলম্বন করা অত্যন্ত আবশ্যক, যাতে এই অসাড় সংসারে জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। এই পথে অগ্রসর

হওয়ার জন্য কোন যোগ্য পথপ্রদর্শক (গুরু) পাওয়া নিতান্ত আবশ্যক। **অনেকে অতীব বিদ্বান অথবা বেদ-বেদান্তে পারঙ্গম হওয়া সত্ত্বেও, নিজের নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছতে পারে না, যতক্ষন না তাকে সাহায্য করার জন্য, কোন যোগ্য পথপ্রদর্শক এসে দাঁড়ায়। তাঁর পদচিহ্ন অনুসরণ করলে, পথের গহ্বর এবং হিংস্র প্রাণীদের ভয় থেকে নিস্তার পাওয়া যেতে পারে।** এই ভাবে সংসার যাত্রা সুগম ও সফল হয়ে দাঁড়ায়। এই বিষয়ে বাবার অভিজ্ঞতা যা, তিনি স্বয়ং বলেছেন- সত্যিই আশ্চর্য্য জনক। যদি আমরা মন দিয়ে সেগুলি শুনি তাহলে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও মুক্তি নিশ্চয়ই লাভ করব।

অন্বেষণ ঃ-

এক সময় আমরা চারজন সহপাঠী এক সাথে ধার্মিক এবং অন্যান্য পুস্তক অধ্যয়ন করছিলাম। এইরূপ প্রবুদ্ধ হয়ে, আমরা ব্রহ্মের মূল স্বরূপের বিষয়ে আলোচনা করতে শুরু করি। একজন বলল যে- "আমাদের স্বয়ং নিজেদের জাগ্রত করা উচিত, অন্যদের উপর নির্ভর করা উচিত নয়।" এই কথার উপর, দ্বিতীয়জন বলল- "যে মন নিগ্রহ করে নিয়েছে, সেই ধন্য। নিজেদের সংকীর্ণ বিচার ও ভাবনা থেকে মুক্ত হতে হবে, কারণ এই সংসারে আমাদের অতিরিক্ত আর কিছুই নেই।" এবার তৃতীয়জন বলে- "এই সংসার পরিবর্তনশীল। কেবল নিরাকারই শাশ্বত। অতএব সত্য ও অসত্যের বিবেক থাকা দরকার।" তখন চতুর্থ জন (স্বয়ং বাবা) বলেন- **"কেবল পুঁথিগত বিদ্যা বা জ্ঞান দিয়ে কোন লাভ হয় না। আমাদের নিজেদের কর্তব্য অবশ্যই করা উচিত।** দৃঢ় বিশ্বাস ও পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে শরীর, মন,

সম্পত্তি এবং পঞ্চপ্রাণাদি সর্বব্যাপক গুরুদেবকে অর্পণ করে দেওয়া উচিত। গুরু ভগবান, সবার সংরক্ষক।" এই ভাবে তর্কাতর্কির পর, আমরা চারজন বনে ঈশ্বরের খোঁজে বেরোই। আমরা চারজন বিদ্বান, কারো সাহায্য না নিয়ে, নিজেদের স্বতন্ত্র বুদ্ধির জোরে, ঈশ্বরের খোঁজ করতে চাইতাম। পথে একটি নিম্ন জাতির লোকের ('বঞ্জারা') সাথে আমাদের দেখা হয়। সে আমাদের জিজ্ঞাসা করে- "আপনারা এত গরমে কোথায় চলেছেন?" প্রত্যুত্তরে আমরা জানাই- "জঙ্গলে খুঁজে দেখছি।" তখন সে জিজ্ঞাসা করে- "কি খুঁজছেন, দয়া করে সেটাই বলুন।" আমরা ওর প্রশ্নটা এড়িয়ে যাই। আমাদের এই ভাবে নিরুদ্দেশ্যে ঘন জঙ্গলে পথভ্রান্ত দেখে, ওর আমাদের উপর দয়া হয়। অতি বিনম্র হয়ে, আমাদের নিবেদন করে বলে- "আপনারা নিজেদের গোপনীয় খোঁজের কথা আমায় না জানালেও, আমি প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি যে, মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড তাপে আপনারা অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছেন। দয়া করে এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে, একটু জলপান গ্রহণ করুন। আপনাদের ধীর ও নম্র হওয়া উচিত। পথপ্রদর্শক ছাড়া, এই অপরিচিত ভয়ানক বনে বৃথা ঘুরে বেড়িয়ে কোন লাভ হবে কি?" ওর বিনম্র প্রার্থনা কোনরূপ গ্রাহ্য না করে, আমরা এগিয়ে যাই। আমাদের এই ধারণাই ছিল যে, লক্ষ্য প্রাপ্ত করতে আমরা স্বয়ং সক্ষম। তাহলে অন্য কারুর সাহায্যের কি দরকার? জঙ্গলটি খুবই বিশাল ও ঘন ছিল। বৃক্ষগুলি এতো উঁচু ও ঘন যে, সেখানে সূর্য্যের আলোও পৌঁছাচ্ছিলনা। শেষে পরিণাম এই হলো যে, আমরা পথ ভুলে অনেকক্ষণ এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে, ভাগ্যবশে আবার ঐ স্থানেই গিয়ে পৌঁছই, যেখান থেকে একটু আগে প্রস্থান করেছিলাম। তখন আবার সেই ব্যক্তিটির সাথে দেখা হয়। সে বলে- "নিজেদের চাতুর্যের উপর নির্ভর করে আপনারা পথভ্রান্ত হলেন। প্রত্যেক ছোট-

বড় কাজে, পথপ্রদর্শকের দরকার হয়। ঈশ্বরের প্রেরণার অভাবে, সৎপুরুষদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া সম্ভব নয়। **খালি পেটে কোন কাজের ফল পাওয়া যায় না। তাই যদি কেউ আগ্রহ করে ভোজনের জন্য আমন্ত্রিত করে, তাহলে সেটা প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়। অন্ন ভগবানের প্রসাদ, সেটি অগ্রাহ্য বা মানা করা উচিত নয়। যদি কেউ খেতে অনুরোধ করে, তাহলে সেটা নিজের সফলতার ঈঙ্গিত জানবেন।"** এই বলে ও আবার অন্ন গ্রহণ করতে অনুরোধ করে। তবুও আমরা ওর অনুরোধ উপেক্ষা করে ওকে মানা করে দিই। ওর সরল ও গূঢ় উপদেশ পরীক্ষা না করেই, আমার তিনটি সহপাঠী সেখান থেকে চলে যায়।পাঠকগণ সহজেই অনুমান করতে পারবেন, কতখানি জেদী ও একগুঁয়ে ছিল তারা। আমি ক্ষিধে এবং তেষ্ঠায় বিচলিত ছিলামই, উপরন্তু ঐ ব্যক্তিটির অপূর্ব প্রেম আমায় আকর্ষিত করে। যদিও আমরা নিজেদের অত্যন্ত বিদ্বান বলে মনে করতাম, কিন্তু দয়া ও কৃপা কাকে বলে, সে বিষয়ে কোন জ্ঞান ছিল না। এক নীচু জাতের, অশিক্ষিত, গ্রাম্যলোক হওয়া সত্ত্বেও, ওর মনে মহান দয়া ছিল। তাই সে আমাদের বার-বার অন্ন গ্রহণ করতে অনুরোধ করছিল। **যারা নিঃস্বার্থে অন্যদের ভালবাসে, তারাই সত্যকার মহান।** আমি ভাবলাম লোকটির অনুরোধ স্বীকার করাটাই, জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য শুভ আবাহন। তাই ওর দেওয়া শুকনো রুটি শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করলাম।

ক্ষুধা নিবারণ হতেই দেখি যে, গুরুদেব আমার সামনে দাঁড়িয়ে। তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন- "এই সব কি হচ্ছিল?" আমি তখন

সব ঘটনাগুলি তাঁকে বললাম। তিনি আশ্বাস দিয়ে বললেন- **"আমি তোমার হৃদয়ের সমস্ত ইচ্ছে পূরণ করে দেব। কিন্তু যে আমার উপর বিশ্বাস রাখবে, শুধু সে-ই সফল হবে।"** আমার তিনটি সহপাঠী, তাঁর কথা বিশ্বাস না করে সেখান থেকে চলে গিয়েছিল। আমি তাঁকে প্রণাম করে, তাঁর আদেশ পালন করার ইচ্ছে প্রকাশ করলাম। এরপর তিনি আমায় একটা কূয়োর কাছে নিয়ে গেলেন। দড়ি দিয়ে পা বেঁধে, আমায় কূয়োতে উল্টো ঝুলিয়ে দিলেন। আমার মাথা নীচে ও পা উপরে ছিল। মাথাটা ছিল জল থেকে প্রায় তিন ফুট উপরে। হাত দিয়ে জল ছোঁবার বা মুখে জল যাওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। আমায় এই ভাবে উল্টো ঝুলিয়ে জানি না তিনি কোথায় চলে গেলেন। প্রায় চার-পাঁচ ঘন্টা পর ফিরে এলেন, এবং আমায় কূয়ো থেকে বাইরে বার করে আনলেন। তারপর আমায় জিজ্ঞাসা করলেন "তোমার ওখানে কিরকম মনে হচ্ছিল?" আমি উত্তর দিই- "পরম আনন্দ অনুভব করছিলাম। আমার মতন মূর্খ এই রকম আনন্দ কি ভাবেই বা ব্যক্ত করতে পারে?" আমার উত্তর শুনে, গুরুদেব অত্যন্ত প্রসন্ন হন এবং তিনি আমায় বুকে জড়িয়ে ধরেন। আমার প্রশংসা করে আমায় নিজের সঙ্গে তাঁর আশ্রমে নিয়ে যান। একটি চড়াইপাখি নিজের ছানাদের যেভাবে দেখা-শোনা করে, ঠিক সেই ভাবে তিনি আমার আদর-যত্ন করতেন। কত সুন্দর ছিল সেই আশ্রম। সেখানে আমি নিজের মা-বাবার কথা ভুলে যাই। অন্যান্য আকর্ষণও দূর হয়ে গিয়েছিল, এবং আমি সহজেই বন্ধন থেকে মুক্তি পাই। আমার সব সময় মনে হত যে, তাঁর বুকের মাঝেই লুকিয়ে থাকি। যদি কখনও চোখের সামনে তাঁর মূর্ত্তিটি না ভাসত - তবে মনে হতো অন্ধ হয়ে যাওয়াই ভালো।

এইরকম ছিল সেই আশ্রম। সেখানে পৌঁছে কেউ খালি হাতে ফেরেনি। তিনি আমার ঘর-বাড়ী, মাতা-পিতা, ধন-সম্পত্তি- সর্বস্ব ছিলেন। আমার ইন্দ্রিয়গুলি নিজেদের কর্ম ছেড়ে, আমার চোখে কেন্দ্রিভূত হয়ে যায় এবং আমার চোখ তাঁর উপর। আমার এমন অবস্থা হয়ে গিয়েছিল যে, দিন-রাত আমি তাঁরই ধ্যানে নিমগ্ন থাকতাম। আমার আর কোন কথারই জ্ঞান ছিল না। **এই ভাবে ধ্যান ও চিন্তন করতে-করতে, আমার মন ও বুদ্ধি স্থির হয়ে যায়।** আমি স্তব্ধ হয়ে মনে-মনেই তাঁকে প্রণাম করতাম। অন্য অনেক আধ্যাত্মিক কেন্দ্র আছে, যেখানে এক ভিন্ন দৃশ্য দেখা যায়। সাধক সেখানে জ্ঞানপ্রাপ্ত করতে যায় এবং দ্রব্য ও সময়ের অপব্যয় করে। কঠিন পরিশ্রমও করে কিন্তু শেষে অনুতাপ হয়। সেখানে গুরুর গুপ্ত জ্ঞান-ভাণ্ডারের অভিমান দেখতে পাওয়া যায়। তাঁরা পবিত্র ও শুদ্ধ হওয়ার অভিনয় তো করেন, কিন্তু তাঁদের মনে দয়া লেশমাত্রও দেখা যায় না। তাঁরা উপদেশ দেন বেশী ও নিজেদের কীর্তির স্বয়ংই গুণগান করেন। কিন্তু তাঁদের কথা হৃদয়স্পর্শী হয় না। তাই সাধকও তৃপ্তি পায় না। এমনি অবস্থায় আত্মদর্শন দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। এই ধরনের কেন্দ্র, সাধকদের জন্য কতটা হিতকর, বা সেখানে কোন উন্নতি কি করে আশা করা যেতে পারে? যে গুরুর শ্রীচরণের বর্ণনা একটু আগে করলাম, তিনি ছিলেন ভিন্ন শ্রেণীর। কেবল তাঁর কৃপাদৃষ্টির প্রভাবে, আপনা-আপনি অনুভূতি প্রাপ্ত হয়ে গেল এবং আমায় কোন চেষ্টা বা বিশেষ অধ্যয়ন করার দরকার হল না। আমায় কোন বস্তু খোঁজারও দরকার হল না বরং প্রত্যেকটি বস্তু দিনের আলোর ন্যায় পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। কেবল গুরুই জানেন যে, কি ভাবে কূয়োতে আমাকে উল্টো করে ঝোলানো আমার জন্য

পরামানন্দের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আমার ঐ তিনটি সহপাঠীদের মধ্যে একজন মহান কর্মকাণ্ডী ছিল। কর্ম করে কি ভাবে তার থেকে নির্লিপ্ত থাকা যেতে পারে, সেটা ও ভালো ভাবে জানত। দ্বিতীয়জন ছিল জ্ঞানী, সর্বদা জ্ঞানের অহংকারে মত্ত থাকত। তৃতীয়জন ঈশ্বরভক্ত এবং অনন্য রূপে ভগবানের শরণাগত হয়ে ভগবানকেই কর্তা মানত। যখন ওরা এইরূপ তর্কালোচনা করছিল, তখনই ঈশ্বর সম্বন্ধী প্রশ্ন ওঠে এবং কারো সাহায্য না নিয়েই, ওরা নিজেদের ব্যক্তিগত জ্ঞানের উপর নির্ভর করে, ঈশ্বরের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে।

শ্রীসাই, বিবেক ও বৈরাগ্যের প্রত্যক্ষ মূর্তি স্বরূপ, এই তিনজনের সঙ্গে ছিলেন। এখানে কেউ প্রশ্ন করতে পারে- "স্বয়ং ব্রহ্মের অবতার হয়ে, তিনি ঐ লোকেদের সঙ্গে মিশে, এমন বোকা সাজলেন কেন?" অবতারপুরুষ হওয়া সত্ত্বেও, তিনি এক নীচু বাঞ্জারার ভোজন সানন্দে গ্রহণ করেন, কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন 'অন্নম্ ব্রহ্ম'। ভোজনের আগ্রহ উপেক্ষা করলে এবং গুরু ছাড়াই জ্ঞান প্রাপ্ত করতে চাইলে, তাদের কি দশা হয়, তারই এক উদাহরণ প্রস্তুত করেন। শ্রুতি বলে যে, বাবা, মা ও গুরুর পূজো এবং ধার্মিক গ্রন্থের (শাস্ত্র) অধ্যয়ন করা উচিত। এইগুলি চিত্ত-শুদ্ধির পথ এবং **যতক্ষন চিত্ত শুদ্ধ না হয়, ততক্ষন আত্মানুভূতির আশা করা বৃথা।** এই ভাবে জ্ঞান ও তর্ক আমাদের কোন সাহায্য করতে পারে না। **শুধু গুরু-কৃপা দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্তি সম্ভব।** শ্রী সাইয়ের দরবারে নানা রকমের লোকেদের দর্শন হত। দেখো, জ্যোতিষীরা আসছেন এবং ভবিষ্যৎ ব্যাখ্যান করছেন। অন্যদিকে রাজকুমার, শ্রীমান, সম্পন্ন ও নির্ধন, সন্ন্যাসী, যোগী ও গায়ক দর্শন করতে আসছে। এমন কি এক অতি শুদ্রও দরবারে এসে বাবাকে প্রণাম করে বলে, "সাই-

ই আমার বাবা-মা এবং এই জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে আমাকে মুক্ত করে দেবেন।" আরো অনেকে - ঐন্দ্রজালিক, অন্ধ, পঙ্গু, নাথপন্থী, নর্ত্তক ও শিল্পী, ইত্যাদি, বহু রকমের লোক - বাবার দরবারে আসত। সেখানে তাদের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা হতো। এই ভাবে উপযুক্ত সময়, সেই পথিকটিও আবির্ভূত হয় এবং যে চরিত্রটি ওকে অভিনয় করতে দেওয়া হয়, সেটা ও সম্পন্ন করে। কূয়োতে ৪-৫ ঘন্টা উল্টো ঝোলানো থাকাটা, আমাদের একটা সামান্য ঘটনা মনে করা উচিত নয়। এমন কেউ বিরলই হবে যে এরকম এতক্ষণ উল্টো ঝোলানো থাকা সত্ত্বেও, কষ্ট অনুভব না করে পরামনন্দের অনুভূতি পায়। বরং ব্যথা বা কষ্ট পাওয়ারই সম্ভাবনা বেশী। তাই এমন মনে হয় যে, এখানে সমাধি অবস্থার চিত্র আঁকা হয়েছে। আনন্দ দুরকমের হয় - প্রথম ঐন্দ্রিক এবং দ্বিতীয় আধ্যাত্মিক। ঈশ্বর আমাদের ইন্দ্রিয় ও মনের প্রবৃত্তির রচনা বাহ্যমুখী করেছেন। তাই যখন সেগুলি (ইন্দ্রিয় ও মন) নিজেদের বিষয় পদার্থের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তখন আমরা ইন্দ্রিয় চৈতন্যতা প্রাপ্ত করি, যার ফলস্বরূপ আমরা সুখ ও দুঃখ পৃথক বা সম্মিলিত ভাবে অনুভব করি, পরমানন্দ নয়। কিন্তু যখন ইন্দ্রিয় ও মনকে বিষয় পদার্থ থেকে সরিয়ে অন্তর্মুখী করে আত্মার উপর কেন্দ্রিভূত করা হয় তখন আমাদের আধ্যাত্মিক বোধ জাগ্রত হয় এবং সেই আনন্দ মুখ দিয়ে বর্ণনা করা যায় না। "আমি পরমানন্দে ছিলাম এবং সেই মূহূর্তের বর্ণনা আমি কিভাবে করতে পারি?" এই শব্দগুলির দ্বারা বোঝা যায় যে গুরু তাঁকে সমাধি অবস্থায় রেখে চঞ্চল ইন্দ্রিয় ও মনরূপী জল থেকে দূরে রেখেছিলেন।

উপবাস এবং শ্রীমতি গোখ্‌লে ঃ-

বাবা স্বয়ং কখনো উপবাস করেননি এবং তিনি

অন্যদেরও করতে দিতেন না। যারা উপবাস করে, তাদের মন কখনো শান্ত থাকে না। সে ক্ষেত্রে ওদের পরমার্থের প্রাপ্তি কিভাবে সম্ভব? সর্বপ্রথম আত্মার তৃপ্তি আবশ্যক। ক্ষুধার্ত থেকে খালি পেটে ঈশ্বর প্রাপ্তি হতে পারে না। যদি পেটে অন্ন ও পুষ্টি না থাকে, তাহলে আমরা কোন চোখ দিয়ে ঈশ্বর দর্শন করব, কোন্ জিভ দিয়ে তাঁর মহানতা বর্ণনা করব এবং কোন কান দিয়ে তাঁর লীলা শ্রবণ করব? সারাংশ এই যে, সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি যথেষ্ট ভোজন ও পুষ্টি পেয়ে যখন বলিষ্ট থাকে, তখনই আমরা ভক্তি এবং ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য সাধনা করতে পারি। **তাই আমাদের উপবাস বা অত্যাধিক ভোজন, কোনটাই করা উচিত নয়। আহারে সংযম, রাখা শরীর ও মন, দুইয়ের জন্যই উত্তম।** শ্রীমতি কাশীবাঈ কাণিট্‌করের (শ্রীসাই বাবার এক ভক্ত) কাছ থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে, শ্রীমতি গোখ্‌লে দাদা কেলকরের কাছে শিরডী আসেন। উনি এই দৃঢ় সংকল্প করে আসেন যে, বাবার শ্রী চরণে বসে তিন দিন উপবাস করবেন। ওঁর শিরডী পৌঁছবার আগেই, বাবা দাদা কেলকরকে বলেন- "আমি দোলের দিন নিজের সন্তানদের ক্ষুধার্ত দেখতে পারি না। যদি ওদের অনাহারেই থাকতে হয়, তাহলে আমি এখানে আছি কি করতে ?" পরের দিন ঐ মহিলা দাদা কেলকরের সাথে মস্‌জিদে পৌঁছে বাবার চরণকমলের কাছে বসতেই, বাবা বলেন- **"উপবাসের প্রয়োজনটাই কি ?** দাদা ভট্টের বাড়ী গিয়ে 'পুরণপোলী' তৈরী করো। ওঁর ছেলে-মেয়েদের খাওয়াও ও নিজেও খাও।" সেটা ছিল দোলের দিন এবং সেই সময় শ্রীমতি কেলকর মাসিক ধর্মে ছিলেন। দাদাভট্টের বাড়ীতে

খাবার তৈরী করার কেউ ছিল না। তাই বাবার যুক্তি খুবই সময়োচিত প্রমাণিত হয়। শ্রীমতি গোখ্‌লে দাদাভট্টের বাড়ী গিয়ে রান্না করে সবাইকে খাইয়ে নিজেও খান। কি চমৎকার এই গল্প ও কত সুন্দর তাঁর শিক্ষা!

বাবার 'সরকার' ঃ-

বাবা নিজের ছোটবেলার একটি কাহিনী এই ভাবে বর্ণনা করেন -

ছোটবেলায় জীবিকা উপার্জন করার জন্য আমি বীডগ্রাম যাই। সেখানে আমি জরির কাজ পাই এবং পূর্ণ উৎসাহ ও একাগ্র মনে কাজ করতাম। আমার কাজ দেখে মালিক খুব খুশী হতেন। আমার সাথে আরো তিনটে ছেলে কাজ করত। প্রথম জন ৫০ টাকা, দ্বিতীয়জন ১০০ টাকা এবং তৃতীয়জন ১৫০ টাকা পেত। আমি ঐ তিনজনের চেয়ে দ্বিগুণ কাজ করতাম। আমার নিপুণতা দেখে মালিক আমার প্রশংসা করতেন। উনি আমায় খুব ভালবাসতেন এবং আমায় একটা পোষাকও উপহার দেন। তার মধ্যে মাথার পাগড়ী ও গা ঢাকার জন্য একটা শালও ছিল। সেই পোষাকটি আমার কাছে এখনও নতুনই রাখা আছে। আমি ভাবলাম যে মানুষ দ্বারা নির্মিত সব কিছুই তো নশ্বর ও অপূর্ণ। কিন্তু আমার 'সরকার' (ভগবান) যা দেন, সেটাই শেষ পর্যন্ত থাকবে। মানুষের দেওয়া কোন উপহারের সাথে তার তুলনা সম্ভব নয়। আমার মালিক বলেন- "নাও, নাও।" লোকেরা আমার কাছে এসে বলে- "আমায় দাও, আমায় দাও।" কিন্তু আমি যা বলি, তার দিকে কেউ মন দেয় না। আমার মালিকের ভাণ্ডার (আধ্যাত্মিক সম্পদ) ভরপুর এবং সমানেই উপছে পড়ছে। আমি তো

বলি- গাড়ী বোঝাই করে নিয়ে যাও। মায়ের খাঁটি সন্তান হলে, এই সম্পদে নিজেকে ভরে নেবে। আমার ফকিরের কৌশল, আমার ভগবানের লীলা ও আমার 'সরকারের' দক্ষতা অতুলনীয়। আমার আর কি, এই শরীর মাটির সঙ্গে মিলে সমস্ত ভূমণ্ডলে ব্যাপ্ত হয়ে যাবে, এবং এই সুযোগ আর কখনো পাবে না। আমি যেখানেই যাই, যেখানেই বসি, মায়া আমায় কষ্ট দেয়। তা সত্ত্বেও আমি নিজের ভক্তদের কল্যাণের বিষয়ে সর্বদা উৎসুক থাকি। **যে যাই করুক, একদিন তার ফল সে অবশ্যই পাবে এবং যে আমার এই কথা মনে রাখবে, সে অমূল্য সুখশান্তির অধিকারী হবে।**

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

অধ্যায় - ৩৩

উদীর মহিমা (ভাগ - ১)

বিছের কামড়, প্লেগের গাঁট, জামনেরের চমৎকার, নারায়ণ রাও, বালা বুওয়া সুতার, আপ্পাসাহেব কুলকার্ণী, হরি ভাউ কার্ণিক।

এর আগের অধ্যায়ে গুরুর মহানতার দিগ্‌দর্শন করানো হয়েছিল। এবার এই অধ্যায়ে 'উদীর' মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হবে।

প্রস্তাবনা ঃ-

আসুন, আগে আমরা সন্তদের চরণে প্রণাম করি, যাঁদের মাত্র কৃপাদৃষ্টি দ্বারা সমস্ত পাপ ভস্ম হয়ে আমাদের আচরণের দোষ নষ্ট হয়ে যাবে। তাঁদের উপদেশ আমাদের জন্য হয়ে ওঠে পরম শিক্ষাপ্রদ ও অক্ষয় সুখের উৎস। তাঁরা নিজেদের মনে- "এটা আমার, ওটা তোমার" এমন কোন প্রভেদ রাখেন না। এই ধরনের মনোভাব স্বপ্নেও তাঁদের হৃদয়ে উৎপন্ন হয় না। তাঁদের ঋণ, এই জন্মে তো দূর, অনেক জন্মেও শোধ করতে পারব না।

উদী (বিভূতি) ঃ-

এটা তো সবাই জানে যে, বাবা লোকেদের কাছ থেকে দক্ষিণা নিতেন এবং ঐ টাকা থেকে লোকেদের দান করার পর যা বাঁচত, সেটা দিয়ে কয়লা বা কাঠ কিনে, সব সময় ধুনি জ্বালিয়ে রাখতেন। এই ধুনির ভস্মকে 'উদী' বলা হয়। শিরডী থেকে রওনা হওয়ার সময় ভক্তদের এই ভস্ম মুক্তহস্তে বিতরণ করা হতো। এই 'উদী'র

মাধ্যমে বাবা আমাদের কি শিক্ষা দিতেন? উদী বিতরণ করে, বাবা আমাদের শেখাতেন যে, ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুগুলি ক্ষণস্থায়ী এবং একদিন ভস্মেই পরিণত হবে। আমাদের দেহ ইন্ধনের মতো পঞ্চভূতাদি দ্বারা নির্মিত, সাংসারিক ভোগাদির পর ধ্বংস হয়ে ভস্ম রূপে পরিণত হয়ে যাবে। সব শেষে এই দেহটা ভস্ম হয়ে যাবে- এই কথাটা স্মরণ করাবার জন্য বাবা উদী বিতরণ করতেন। এই উদীর দ্বারা তিনি আরো একটা শিক্ষা দিতেন- ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। **এই সংসারে বস্তুতঃ কেউ কারো পিতা, পুত্র বা স্ত্রী নয়। আমরা এই জগতে একলাই এসেছি এবং একলাই চলে যাবো।** আগেও দেখা গেছে এবং এখনো অনুভব করা হয়, এই উদী অনেকের শারীরিক এবং মানসিক ব্যাধি হরণ করেছে। আসলে বাবা ভক্তদের দক্ষিণা ও উদীর মাধ্যমে সত্য ও অসত্যের প্রতি বিচারশক্তি এবং অসত্য ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত বোঝাতে চাইতেন। আমরা উদীর মাধ্যমে বৈরাগ্য ও দক্ষিণার মাধ্যমে ত্যাগের শিক্ষা পাই। এই দুটি না থাকলে, এই মায়ারূপী ভবসাগর পার করা কঠিন। তাই বাবা অন্যের ভোগ স্বয়ং ভোগ করে, দক্ষিণা স্বীকার করতেন। ভক্তরা যখন রওনা হওয়ার অনুমতি নিতে যেত, তখন তিনি প্রসাদ রূপে খানিকটা উদী দিয়ে ও কিছুটা ওদের কপালে লাগিয়ে, নিজের হাত ওদের মাথায় রাখতেন। বাবা প্রসন্ন চিত্তে থাকলে প্রেমপূর্বক গান গাইতেন। এমনি একটা ভজন উদীর বিষয়েও ছিল। ভজনের শব্দগুলি- রমতে রাম আয়ো জী, আয়ো জী, উদিয়া কী গোনিয়া লায়ো জী - "ঐ দেখো শ্রী রাম ভ্রমণ করতে করতে এসেছেন ও থলিতে উদী ভরে এনেছেন।" বাবা এই ভজনটি মধুর সুরে গাইতেন। এ তো হল উদীর আধ্যাত্মিক মর্মার্থ। কিন্তু এতে পার্থিব তাৎপর্য্য

আছে, যার দ্বারা ভক্তরা স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি, চিন্তামুক্তি ও অনেক সাংসারিক লাভ প্রাপ্ত করে। তাই উদী আমাদের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক- দুরকমই লাভ প্রদান করে। এবার আমরা উদীর মহিমার কথা আরম্ভ করছি।

বিছের কামড় ঃ-

নাসিকে শ্রী নারায়ণ মোতীরাম জানী বাবার এক পরম ভক্ত ছিলেন। উনি বাবারই আরেক ভক্ত শ্রী রামচন্দ্র বামন মোডকের অধীনে কাজ করতেন। একবার উনি নিজের মাকে নিয়ে বাবার দর্শন করতে শিরডী আসেন। তখন বাবা ওঁর মাকে বলেন- "এবার তোমার ছেলের চাকরী ছেড়ে নিজের ব্যবসা শুরু করা উচিত।" কিছুদিনের মধ্যেই বাবার কথা ফলে গেল। নারায়ণ রাও চাকরী ছেড়ে, 'আনন্দ আশ্রম' নামে একটা মনিহারি দোকান খোলেন। একবার নারায়ণ রাও-য়ের এক বন্ধুকে বিছে কামড়ালো। অসহ্য যন্ত্রণায় কষ্ট পেতে লাগলেন। এ সব ব্যাপারে উদী একেবারে রামবাণ- কামড়ের জায়গায় শুধু লাগিয়ে দিতে হয়। নারায়ণ উদী খুঁজে পাচ্ছিলেন না। উনি বাবার ছবির সামনে দাঁড়িয়ে সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করেন। বাবার নাম নিয়ে, তাঁর ছবির সামনে রাখা ধূপের থেকে এক চিমটে ভস্ম, বাবার উদীর সমান মনে করে, কামড়ের জায়গায় লাগিয়ে দিলেন। সেখান থেকে হাত সরাতেই, ব্যথা তক্ষুনি কমে যায় এবং দুজনেই অত্যন্ত খুশী হয়ে নিজের-নিজের বাড়ী ফিরে যান।

প্লেগের গাঁট ঃ-

এক সময় বান্দ্রায় থাকাকালীন এক ভক্ত জানতে পারেন যে, ওর মেয়ে প্লেগগ্রস্ত এবং ওর শরীরে গাঁট বেরিয়ে এসেছে। ভক্তটির

কাছে সেই সময় উদী ছিল না। তাই তিনি নানাসাহেব চাঁদোরকরের কাছে উদী দেওয়ার জন্য খবর পাঠান। যখন নানাসাহেবের কাছে এই খবর পৌঁছয়, তখন উনি ঠানে ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে এবং স্ত্রীর সঙ্গে কল্যাণ যাচ্ছিলেন। ওঁর কাছেও সেই সময় উদী ছিল না। রাস্তা থেকে খানিকটা ধূলো উঠিয়ে, শ্রীসাই বাবার ধ্যান করে এবং সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করে সেই ধূলোটি নিজের স্ত্রীর মাথায় লাগিয়ে দেন। ভক্তটি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে এই সব দেখছিলেন। বাড়ী ফিরে জানতে পারেন যে, যে সময় নানাসাহেব ঠানে ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে বাবার কাছে সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করেন, তখন থেকেই যথেষ্ট পরিবর্তনের ফলে, মেয়ে আরাম পেয়েছে। মেয়েটি গত তিনদিন ধরে কষ্ট পাচ্ছিল।

জামনেরের বিলক্ষণ চমৎকার ঃ-

১৯০৪-০৫ সালে খানদেশ জেলার জামনের শহরে মাম্‌লৎদার ছিলেন- নানাসাহেব চাঁদোরকর। জামনের শিরডী থেকে প্রায় ১০০ মাইল দূরে। ওঁর মেয়ে ময়নাতাঈ ছিলেন আসন্ন প্রসবা। ২-৩ দিন আগে থেকে, ওঁর প্রসব পীড়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। নানাসাহেব সব সম্ভব চেষ্টা করেন, কিন্তু কষ্ট কম হয় না। তখন উনি বাবার ধ্যান করে, সাহায্য প্রার্থনা করেন। ঐ সময় রামগীর বুওয়া, যাকে বাবা 'বাপুগীর বুওয়া' বলে ডাকতেন, শিরডী থেকে নিজের বাড়ী খানদেশে ফিরছিলেন। বাবা ওকে ডেকে বলেন- "তুমি বাড়ী যাওয়ার পথে কিছুক্ষণের জন্য জামনেরে গিয়ে এই উদী এবং আরতি শ্রী নানাসাহেবকে দিয়ে দিও।" রামগীর বুওয়া বলেন- "আমার কাছে তো মাত্র দু টাকা আছে। সেটা বোধহয় জলগাঁও অবধি ভাড়া দিতেই, শেষ হয়ে যাবে। তবে এই অবস্থায় সেখান থেকে আরো ৩০ মাইল

যাওয়া, আমার পক্ষে কি করে সম্ভব হবে?" তাতে বাবা উত্তর দেন- "চিন্তা করো না। তোমার সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।" বাবা শামাকে দিয়ে মাধব অডকর দ্বারা রচিত প্রসিদ্ধ আরতির প্রতিলিপি তৈরী করিয়ে উদীর সাথে নানাসাহেবের জন্য পাঠিয়ে দেন। বাবার আশ্বাস পেয়ে রামগীর বুওয়া শিরডী থেকে প্রস্থান করেন এবং প্রায় রাত্তির পৌনে তিনটের সময় জলগাঁওএ এসে পৌঁছন। ওঁর পকেটে তখন দু আনা পড়েছিল। বড়ই অসুবিধেজনক অবস্থা। এমন সময় উনি একটি আওয়াজ শুনতে পান - 'শিরডী থেকে বাপুগীর বুওয়া কে এসেছেন উনি এগিয়ে গিয়ে বলেন- "আমিই শিরডী থেকে আসছি।, আমার নামই বাপুগীর বুওয়া।" তখন ঐ চাপরাশীটি ওঁকে নিয়ে বাইরে এসে একটা সুন্দর টাঙ্গাতে বসায়। সে জানায় যে, সে নানাসাহেব চাঁদোরকরের নির্দেশেই, তাঁকে জামনের নিয়ে যেতে এসেছে। এবার ওঁরা দুজনে রওনা হন। মাঝে ঘোড়া দুটিকে জল খাওয়ানোর জন্য, টাঙ্গা থামানো হয়। সেই সময় চাপরাশীটি রামগীর বুওয়াকেও, জলপান করতে অনুরোধ করে। লোকটির দাড়ি-গোঁফ ও বেশভূষা দেখে তাকে মুসলমান ভেবে, রামগীর বুওয়া জলপান করতে অস্বীকার করেন। তখন চাপরাশীটি জানায় যে, সে গাড়ওয়ালের হিন্দু ক্ষত্রিয়। ঐ সব জলখাবার নানাসাহেবই বুওয়ার জন্য পাঠিয়েছেন। তাই ওঁর তাতে আপত্তি বা সন্দেহ করা উচিত নয়। এরপর দুজনে জলপান করে আবার রওনা হন এবং সূর্যোদয় কালে জামনের পৌঁছন। রামগীর বুওয়া প্রস্রাব করতে যান। একটু পরেই ফিরে এসে দেখেন যে, সেখানে টাঙ্গা, টাঙ্গার দুটি ঘোড়া ও সেই চাপরাশীটি (সহিস) কেউই নেই। ওঁর মুখ থেকে একটা শব্দও বেরোয় না। উনি কাছের কাছারীতে খোঁজ করতে যান এবং সেখানে জানতে পারেন যে, সেই সময় মাম্‌লৎদার নিজের বাড়ীতেই আছেন। বাপুগীর নানাসাহেবের

বাড়ী গিয়ে পৌঁছন এবং ওঁকে বলেন- "আমি শিরডী থেকে বাবার আরতি ও উদী নিয়ে এসেছি।" সেই সময় ময়নাতাঈয়ের অবস্থা খুবই চিন্তাজনক। নানাসাহেব ভাবেন যে বাবার সাহায্য খুবই সময়োপযোগী। কিছুক্ষণ পরই খবর আসে যে, প্রসব সকুশলে ও নির্বিঘ্নে হয়ে, সমস্ত ব্যথা দূর হয়ে গেছে। এরপর রামগীর বুওয়া নানাসাহেবকে ষ্টেশনে টাঙ্গার সাথে খাবার পাঠানোর জন্য ধন্যবাদ জানান। সে কথা শুনে, নানাসাহেব অবাক হয়ে বলেন- "আমি তো কোন টাঙ্গা বা চাপরাশী পাঠাইনি আর শিরডী থেকে আপনার আসার কোন খবরও পাইনি।" ঠানের শ্রী বি. ভি. দেব এই সম্বন্ধে শ্রী নানাসাহেব চাঁদোরকরের পুত্র বাপুসাহেব চাঁদোরকর এবং শিরডীর রামগীর বুওয়াকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তারপর সন্তুষ্ট হয়ে, শ্রী সাই লীলা পত্রিকা **১৩** তে গদ্য ও পদ্য রূপে একটি সুন্দর রচনা প্রকাশ করেন। শ্রী নরসিংহ স্বামী **১)** ময়নাতাই (ভাগ **৫,** পৃষ্ঠ **১৪) ২)** বাপুসাহেব চাঁদোরকর (ভাগ **২০,** পৃষ্ঠ **৪০)** এবং **৩)** রামগীর বুওয়ার (ভাগ **২৭,** পৃষ্ঠ **৮৩)** বক্তব্য নিজের বইতে ("ভক্তদের অভিজ্ঞতা", ভাগ-**৩)** প্রকাশ করেছেন। নিম্নলিখিত প্রসঙ্গ রামগীর বুওয়ার কথানুসারে উদ্ধৃত করা হচ্ছে -

"একদিন বাবা আমায় নিজের কাছে ডেকে একটা উদীর পুরিয়া এবং একটা আরতির প্রতিলিপি দিয়ে বলেন- "জামনের যাও। এই আরতি ও উদী নানাসাহেবকে দিয়ে দিও।" আমি বাবাকে জানাই যে আমার কাছে মোট দু'টাকাই আছে। কোপরগ্রাম থেকে জলগাঁও এবং সেখানে থেকে গরুর গাড়ীতে জামনের যাওয়ার জন্য এই টাকায় কুলোবে না। বাবা বলেন- "আল্লাহ দেবেন।" আমি শুক্রবারে রওনা হই। মনমাড বিকেল **৬.৩০** মিনিটে ও জলগাঁও রাত্রি দুটো বেজে

পঁয়তাল্লিশ মিনিটে পৌঁছই। সেই সময় প্লেগ সংক্রান্ত বিধিনিষেধের কড়াকড়ি ছিল। তাই আমার একটু অসুবিধেই হয়। আমার চিন্তা হচ্ছিল- জামনের যাই কি করে? রাত্তির তিনটে নাগাদ, পায়ে বুট ও মাথায় পাগড়ী পরা একটি চাপরাশী এসে আমায় টাঙ্গায় বসতে বলে এবং আমরা সেই টাঙ্গায় রওনা হই। আমার বেশ ভয় হচ্ছিল। রাস্তায় জলপানও করি। ভোরবেলা জামনের পৌঁছই। প্রস্রাব করার পর ফিরে এসে দেখি যে, সেখানে কিছুই নেই। টাঙ্গা ও টাঙ্গাওয়ালা, দুই-ই অদৃশ্য।"

নারায়ণ রাও ঃ-

ভক্ত নারায়ণ রাও বাবার তিনবার দর্শন পান। বাবা সমাধিস্থ **(১৯১৮)** হওয়ার তিন বছর পর, উনি শিরডী যেতে চাইছিলেন। কিন্তু কোন-না-কোন কারণে যাওয়া হয়ে উঠছিল না। বাবার মহাসমাধির পর এক বছরের মধ্যেই উনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। কোন চিকিৎসাই কাজে লাগে না। তখন উনি অষ্টপ্রহর বাবার ধ্যান করা শুরু করেন। এক রাতে উনি স্বপ্ন দেখেন যে, বাবা একটা গুহা থেকে বেরোচ্ছেন এবং সান্ত্বনা দিয়ে বললেন- "ভয় পেও না। তুমি কাল থেকেই আরাম পেতে শুরু করবে এবং এক সপ্তাহের মধ্যেই চলতে-ফিরতে পারবে।" ঠিক অতটা সময়ের মধ্যে নারায়ণ রাও সুস্থ হয়ে ওঠেন। এবার চিন্তা করার কথা এই যে, বাবাকে কি দেহে থাকাকালীনই জীবিত মানা উচিত এবং যেহেতু দেহত্যাগ করে দিয়েছেন বলে কি মৃত মানা হবে? না। **বাবা অমর- কারণ তিনি জন্ম-মৃত্যুর বাইরে। একবার অনন্য ভাবে যে তাঁর শরণাপন্ন হয়, সে যেখানেই থাকুক না কেন, তাকে তিনি সাহায্য অবশ্যই**

করেন। তিনি সর্বদা আমাদের সঙ্গেই আছেন এবং যে কোন রূপে ভক্তের সামনে প্রকট হয়ে তার ইচ্ছে পূরণ করেন।

আপ্পাসাহেব কুলকার্ণী ঃ-

১৯১৭ সালে আপ্পাসাহেব কুলকার্ণীর জীবনে ভালো সময় আসে। ওঁর ঠানেতে স্থানান্তরণ হয়। বালাসাহেব ভাটে ওঁকে বাবার একটা ছবি দেন। আপ্পাসাহেব সেই ছবিটি পূজো করতে শুরু করেন। উনি পবিত্র মনে পূজো করতেন। রোজ বাবাকে চন্দন এবং নৈবেদ্য অর্পণ করতেন। বাবার দর্শন করার ওঁর তীব্র ইচ্ছে ছিল। এই সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে, উৎসুক হয়ে বাবার ছবিকে দেখাই, বাবার প্রত্যক্ষ দর্শনের সমান। নীচের ঘটনাটি এই কথাটির উদাহরণ।

বালাবুওয়া সুতার ঃ-

বম্বেতে বালাবুওয়া নামে এক সাধু (মহাপুরুষ) ছিলেন। নিজের ভক্তি, ভজন ও আচরণের জন্য উনি আধুনিক তুকারাম নামে বিখ্যাত ছিলেন। **১৯১৭** সালে উনি শিরডী আসেন। বাবাকে প্রণাম করতেই বাবা বলেন- "আমি একে গত চার বছর থেকে জানি।" বালাবুওয়া খুব আশ্চর্য্য হন। উনি মনে-মনে ভাবেন- "আমি তো প্রথমবার শিরডী এসেছি, তাহলে এটা কি করে সম্ভব হতে পারে?" অনেকক্ষণ চিন্তা করার পর, উনি বাবার কথার যথার্থ অর্থ বুঝতে পারেন। উনি মনে-মনেই বলেন- "সন্তরা কত সর্বব্যাপক ও সর্বজ্ঞানী এবং ভক্তদের প্রতি তাঁদের হৃদয়ে অফুরন্ত দয়া। আমি তো কেবল তাঁর ছবিকেই প্রণাম করেছিলাম। সেটাও বাবা জানতে পেরে গেছেন। তাই তিনি আমাকে জানিয়ে দিলেন যে **বাবার ছবি দেখাও যা, বাবাকে**

দেখাও তাই।

এবার আমরা আপ্পাসাহেবের ঘটনায় ফিরে আসি। ঠানেতে থাকাকালীন ওঁকে একবার কোন কাজে ভিবণ্ডী যেতে হয় যেখান থেকে এক সপ্তাহ আগে ফেরা সম্ভব ছিল না। ওঁর অনুপস্থিতিতে তৃতীয় দিন ওঁর বাড়ীতে নিম্নলিখিত বিচিত্র ঘটনাটি ঘটে। দুপুর বেলা আপ্পাসাহেবের বাড়ীতে একটি ফকির আসেন, যাঁর চেহারা বাবার ছবির সাথে হুবহু মিল ছিল। শ্রীমতি কুলকার্ণী ও ছেলে মেয়েরা ওঁকে জিজ্ঞাসা করে- "আপনি শিরডীর শ্রীসাই বাবা তো নন?" এর উত্তরে ফকিরটি জানান যে, উনি সাইবাবার আজ্ঞাকারী সেবক এবং তাঁর আদেশ অনুসারেই ওদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করতে এসেছেন। ফকির দক্ষিণা চান এবং শ্রীমতি কুলকার্ণী ওঁকে এক টাকা দেন। তখন ফকির ওঁকে একটা পুরিয়া দিয়ে বলেন- "এটা নিজের পূজোর জায়গায় ছবির সাথে রেখো।' এই বলে উনি তাদের কল্যাণ কামনা করে, সেখান থেকে চলে যান। এবার বাবার অদ্ভুত লীলার কথা শুনুন।

ভিবণ্ডীতে আপ্পাসাহেবের ঘোড়া অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাই উনি কাজে এগোতে পারেন না। তখন সেই রাত্তিরেই উনি বাড়ী ফিরে আসেন। বাড়ী পৌঁছতেই বৌয়ের কাছে ফকিরের আগমনের খবর পান। ওঁর মন এই ভেবে অশান্ত হয়ে উঠে যে তিনি ফকিরের দর্শন পেলেন না। এবং স্ত্রী যে শুধু এক টাকা দক্ষিণা দেন সেটাও ওঁর ঠিক পছন্দ হয় না। উনি বলেন- "আমি হলে, ১০ টাকার কম কখনোই দিতাম না।" তখন উনি খালি পেটেই, ফকিরের খোঁজে বেরিয়ে পড়েন। মস্‌জিদ ও অন্যান্য অনেক জায়গায় খোঁজেন, কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়। পাঠকগণ! অধ্যায় ৩২তে বাবার কথাগুলি স্মরণ করুন - **'খালি পেটে ঈশ্বরের খোঁজ করা উচিত নয়।"**

আপ্পাসাহেব এই শিক্ষাটি পেয়ে যান। খাবার খাওয়ার পর, যখন উনি শ্রী চিত্রের সাথে বেড়াতে বেরোন, তখন একটু দূরে যেতেই দেখেন যে, সামনে থেকে একটি ফকির দ্রুত গতিতে ওঁর দিকেই এগিয়ে আসছেন। আপ্পাসাহেব ভাবেন- "এঁকে দেখে, ঐ ফকিরটি বলেই তো মনে হচ্ছে। এঁকে দেখতেও ঠিক বাবার (ছবির) মতনই।" ফকির কাছে আসতেই, হাত বাড়িয়ে দক্ষিণা চান। আপ্পাসাহেব ওঁকে এক টাকা দেন, তখন উনি আরো টাকা চান। এবার আপ্পাসাহেব দু'টাকা দেন, তাও ফকিরের মন ভরে না। উনি নিজের বন্ধুর কাছ থেকে তিন টাকা নিয়ে ফকিরকে দেন। তবুও ওঁকে দেখে ঠিক সন্তুষ্ট হয়েছেন বলে মনে হচ্ছিল না এবং উনি আরো চাইছিলেন। তখন আপ্পাসাহেব ফকিরকে তাঁদের সঙ্গে বাড়ী আসতে অনুরোধ জানান। বাড়ীতে এসে ফকিরকে আরো তিন টাকা দিলেন- সবশুদ্ধ নয় টাকা হল। কিন্তু ফকির আবার দাবী করলেন। তখন আপ্পাসাহেব বলেন- "আমার কাছে ১০ টাকার একটা নোট আছে।" ফকির সেই নোটটি নিয়ে ঐ ৯ টাকা ফিরিয়ে সেখান থেকে চলে যান। আপ্পাসাহেব ১০ টাকা দেবেন বলেছিলেন, তাই ওর কাছ থেকে ১০ টাকা নিয়ে নেন। তিনি বাবার স্পর্শ করা ৯ টাকা ফেরত পান। ৯ সংখ্যাটি খুবই অর্থপূর্ণ এবং নববিধা ভক্তির দিকে ইঙ্গিত করে (দেখুন অধ্যায় ২১)। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, লক্ষ্মীবাঈকেও শেষ সময় বাবা ৯ টাকা দিয়েছিলেন।

উদীর পুরিয়া খুলে আপ্পাসাহেব দেখেন যে, তার মধ্যে ফুলের পাঁপড়ি ও চাল রাখা আছে। কালান্তরে উনি যখন শিরডী যান, তখন বাবা ওঁকে নিজের একটি চুলও দিয়েছিলেন। উনি উদী ও চুল একটা মাদুলিতে রেখে সেটা সর্বদা হাতে বেঁধে রাখতেন। আপ্পাসাহেব উদীর শক্তি বুঝতে পেরেছিলেন। প্রথমে উনি চল্লিশ টাকা বেতন পেতেন।

কিন্তু বাবার উদী পাওয়ার পর, ওঁর বেতন অনেক বেড়ে যায় এবং উনি মান ও খ্যাতি লাভ করেন। এই অস্থায়ী আকর্ষণ ছাড়াও ওঁর আধ্যাত্মিক উন্নতিও হয়। তাই, সৌভাগ্যক্রমে যাদের কাছে উদী আছে, তাদের স্নান করার পর, সেটি কপালে লাগানো উচিত এবং একটু জলে মিশিয়ে তীর্থের ন্যায় গ্রহণ করা উচিত।

হরিভাউ কার্ণিক ঃ-

১৯১৭ সালে গুরু পূর্ণিমার দিন (ডহানু জেলার) ঠানের হরিভাই কার্ণিক শিরডী আসেন এবং উনি বাবার যথাবিধি পূজো করেন। নৈবেদ্য ও দক্ষিণা ইত্যাদি অর্পণ করে শামার মাধ্যমে বাবার কাছে থেকে ফিরে যাওয়ার অনুমতি প্রাপ্ত করেন। মস্‌জিদের সিঁড়ি থেকে নেমেই ওঁর মনে হয় যে বাবাকে আরো এক টাকা অর্পণ করা উচিত। উনি শামাকে ইশারায় ওঁর এই ইচ্ছেটি জানাতে চাইছিলেন- বাবার অনুমতি পাওয়ার পর আবার সিঁড়ি উঠতে ওঁর মন চাইছিল না। কিন্তু শামার ওঁর উপরে চোখ পড়ে না। তাই উনি বাড়ীর দিকে রওনা হয়ে যান। রাস্তায় নাসিকে উনি শ্রীকালা রামের মন্দির দর্শন করতে যান। সন্ত নরসিংহ মহারাজ, মন্দিরের মুখ্যদ্বারের কাছেই বসেছিলেন। হঠাৎ তিনি ভক্তদের ওখানেই ছেড়ে, হরিভাউ-য়ের কাছে এসে ওঁর হাত ধরে বলেন- "আমার টাকাটা দাও।" কার্নিক খুবই আশ্চর্যান্বিত হন এবং সহর্ষে টাকাটা দিয়ে ভাবেন- "আমি বাবাকে এই টাকাটা দেব ভেবেছিলাম। তাই বাবা নরসিংহ মহারাজের রূপে সেটা নিয়ে নিলেন।" এই কাহিনীটি প্রমাণ করে যে, সব মহাপুরুষেরাই মূলতঃ অভিন্ন এবং তাঁরা কোন-না-কোন ভাবে, একত্র হয়ে কাজ করেন।

।। শ্রী সাইনাথার্পণমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

অধ্যায় - ৩৪

উদীর মহিমা (ভাগ - ২)

১) ডাক্তারের ভাইপো ২) ডাক্তার পিল্লে ৩) শামার বৌদি ৪) ইরাণী কন্যা ৫) হরদার এক ভদ্রলোক ৬) বম্বের মহিলার প্রসব পীড়া।

এই অধ্যায়তেও উদীর মাহাত্ম্যের এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে উদীর উপযোগিতা সিদ্ধ হয়, সেই সকল ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

ডাক্তারের ভাইপো ঃ-

নাসিক জেলার মালেগাঁওএ এক ডাক্তার থাকতেন। ওঁর ভাইপো এক অসাধ্য রোগে ভুগছিল। উনি এবং ওঁর ডাক্তার বন্ধুরা, সমস্ত রকমের চিকিৎসা করেন, এমন কি অস্ত্রোপচারও করানো হয়। কিন্তু ছেলেটির তাতে কোন লাভ হয় না। ওর কষ্টের শেষ ছিল না। আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুরা ছেলেটির বাবা-মাকে দৈবিক উপচার চেষ্টা করার পরামর্শ দিয়ে, শ্রীসাই বাবার শরণে যেতে বলে। ওদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, বাবা মাত্র নিজের দৃষ্টি দিয়েই অসাধ্য রোগের হাত থেকে মানুষকে মুক্ত করতে পারেন। এ বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। অতএব বাবা-মা ছেলেটিকে নিয়ে শিরডী আসেন। বাবাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে, তাঁর শ্রী চরণে ছেলেটিকে রেখে অতি নম্র ভাবে মিনতি করেন- "প্রভু আমাদের উপর দয়া করুন। আপনার কীর্তির কথা শুনেই আমরা এখানে এসেছি। দয়া করে এই ছেলেটিকে রক্ষা করুন। প্রভু, আমাদের শুধু আপনিই ভরসা।" প্রার্থনা শুনে বাবার

দয়া হয় এবং উনি সান্ত্বনা দিয়ে বলেন- **"যে এই মস্‌জিদের সিঁড়িতে পা দেয়, তার জীবনে আর কোন দুঃখ থাকে না। চিন্তা কোর না, এই উদী নিয়ে ওকে লাগিয়ে দাও। ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখো। ও এক সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে। এটা মস্‌জিদ নয়, দ্বারকাবতী এবং যে এর সিঁড়ি চড়ে, সে স্বাস্থ্য এবং সুখ লাভ করে এবং তার কষ্ট শেষ হয়ে যায়।"** ছেলেটিকে বাবার সামনে বসানো হলো। তিনি সেই রোগগ্রস্ত জায়গার উপর হাত বুলাতে-বুলাতে, ছেলেটিকে করুণাময় দৃষ্টিতে দেখছিলেন। রোগীকে দেখে প্রসন্ন মনে হচ্ছিল এবং উদী লাগাবার অল্প সময়ের মধ্যেই, সে সুস্থ হয়ে ওঠে। ওর মা-বাবা বাবাকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানিয়ে, ছেলেটিকে নিয়ে বাড়ী ফিরে যান।

এই লীলার কথা শুনে ছেলেটির কাকা, যিনি নিজে একজন ডাক্তার ছিলেন, খুবই আশ্চর্য্য হন এবং ওঁরও বাবার দর্শন করার আগ্রহ জাগে।

বম্বে যাওয়ার পথে, ডাক্তারের ইচ্ছে হল, বাবার সঙ্গে দেখা করবেন। কিন্তু মালেগাঁও ও মনমাডের কাছে কেউ বাবার বিরুদ্ধে কিছু বলে, ওঁকে ভাঙচি দিল। তাই উনি শিরডী যাওয়ার বিচার ছেড়ে, সোজা বম্বে চলে যান। বাকি ছুটির কটা দিন উনি আলীবাগে কাটাতে চাইতেন। কিন্তু বম্বেতে তিন রাত্তির ধরে, উনি একটাই আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলেন- "এখনো কি তুমি আমায় অবিশ্বাস করবে?" তখন ডাক্তার নিজের ধারণা বদলে, শিরডী যাওয়া স্থির করেন। এদিকে বম্বেতে ওঁর এক রোগীর জ্বর কম হওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল

না। তাই একবার ওঁর মনে হয় যে, বোধহয় শিরডী যাত্রা স্থগিত করতে হবে। উনি মনে-মনেই একটা কথা পরীক্ষা করা স্থির করেন যে, যদি রোগী সেদিন ভালো হয়ে যায়, তাহলে পরের দিনই তিনি শিরডী রওনা হবেন। আশ্চর্য্যের কথা এই, যে সময় উনি এই রূপ মনস্থ করেন, ঠিক সেই সময় থেকেই রোগীর জ্বর কমতে শুরু করে এবং ক্রমশঃ স্বাভাবিক হয়ে গেল। তখন উনি নিজের সংকল্প অনুযায়ী শিরডী পৌঁছন এবং বাবার দর্শন করে তাঁকে প্রণাম করেন। বাবা ওঁকে কয়েকটা এমন অভিজ্ঞতা দেন যে, উনি বাবার ভক্তে পরিণত হন।। ডাক্তার ওখানে চার দিন থাকেন এবং উদী ও আশীর্বাদ প্রাপ্ত করে বাড়ী ফিরে আসেন। এক বছরের মধ্যেই পদোন্নতি হওয়ার পর ওঁর স্থানান্তরণ বিজাপুরে হয়। ভাইপোর রোগমুক্ততা ওঁকে বাবার দর্শনের সৌভাগ্য প্রদান করে এবং শিরডী যাত্রা ওঁর মনে শ্রীসাই চরণে প্রগাঢ় প্রীতি উৎপন্ন করে দেয়।

ডাক্তার পিল্লে ঃ-

ডাক্তার পিল্লে বাবার একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। বাবাও ওঁকে খুব স্নেহ করতেন এবং সব সময় 'ভাউ' বলে ডাকতেন। প্রায় সময় ওঁর সাথে কথাবার্তা বলতেন এবং প্রত্যেক বিষয়ে পরামর্শও নিতেন। ডাক্তারেরও সর্বদা এই-ই ইচ্ছে হত যে, উনি সর্বদা বাবার কাছাকাছিই থাকেন। একবার ডাক্তার পিল্লের পায়ে একটি নালী ঘা হয়। উনি কাতর হয়ে কাকা সাহেব দীক্ষিতকে বলেন- "আমার পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। এর চেয়ে মৃত্যু ভালো। আমি জানি এর প্রধান কারণ আমার পূর্বজন্মের কর্ম। বাবাকে গিয়ে আমার এই কষ্ট এবার দূর করতে বলো। আমি নিজের পূর্ব জন্মের কর্ম পরের দশ জন্মে ভুগতে

রাজী আছি।" তখন কাকাসাহেব দীক্ষিত বাবাকে ওঁর অনুরোধটি জানান। সাই তো দয়ারই অবতার। তিনি নিজের ভক্তদের কষ্ট চুপচাপ বসে কি করে দেখতেন? প্রার্থনাটি শুনে বাবা বিচলিত হয়ে দীক্ষিতকে বলেন- "পিল্লেকে গিয়ে বলো, ঘাবড়াবার কিছু নেই। গত জন্মের কর্মের ফল, দশ জন্মে কেন ভুগতে যাবে? কেবল দশ দিনেই সেটা শেষ হয়ে যাবে। আমি তো এখানে তোমাদের পার্থিব ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্যই বসে আছি। **প্রাণত্যাগ করার ইচ্ছে, কখনোই করা উচিত নয়।** যাও, কারো পিঠে চাপিয়ে, ওকে এখানে নিয়ে এসো, আমি এক্ষুনি ওকে কষ্ট থেকে রেহাই পাইয়ে দেব।"

তখন ঐ অবস্থাতেই পিল্লেকে ওখানে আনা হয়। বাবা নিজের ডানদিকে ওর মাথার কাছে নিজের গদিটা দিয়ে আরাম করে শুইয়ে বলেন- "এর আসল ঔষধি তো এই যে, পূর্বজন্মের কর্মফল ভোগ করে জয় করে নেওয়া, যাতে তার থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। আমাদের কর্মই আমাদের সুখ-দুঃখের কারণ, তাই যা-ই পরিস্থিতি আসুক না কেন, তাতেই সন্তোষ রাখা উচিত। আল্লাই সব কর্মের ফল দেন এবং তিনিই সবাইকে রক্ষা করেন। এই বিশ্বাস রেখে সব সময় তাঁকেই স্মরণ করো। তিনি তোমার চিন্তা দূর করবেন। মনে-প্রাণে তাঁরই অনন্য শরণে যাও। তারপর দেখো তিনি কি করেন।" ডাক্তার পিল্লে বললেন- " আন্নাসাহেব আমার পায়ে পট্টী বেঁধে দিয়েছেন, কিন্তু আমার তাতে কোন লাভ হচ্ছে না।" "নানা তো বোকা। এই পট্টীটা সরাও, নয়তো মরে যাবে। একটু পরেই একটা কালো কাক এসে ঠোকর মারবে। তখন তুমি খুব শীঘ্র ভালো হয়ে যাবে।"

যে সময় এই সব কথাবার্তা চলছিল, আব্দুল (যে মস্‌জিদে ঝাড়ু লাগাতো এবং প্রদীপ ইত্যাদি পরিষ্কার করত) সেখানে এসে উপস্থিত হল। প্রদীপ পরিষ্কার করতে-করতে, হঠাৎ ওর পা ডাক্তার পিল্লের ঘায়ের উপর গিয়ে পড়ে। পাটা ফোলা তো ছিলই। তার উপর আব্দুলের পায়ের চাপ পড়তেই, তার থেকে সাতটা ঘায়ের পোকা বেরিয়ে আসে। কষ্ট অসহ্য হয়ে দাঁড়ায় এবং ডাক্তার পিল্লে জোরে চেঁচিয়ে ওঠেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই শান্ত হয়ে গান গাইতে শুরু করেন। তখন বাবা বলেন- "দেখো, ভাউ এবার ভালো হয়ে গেছে এবং গান গাইছে। গানের বুলি ছিল -

দয়া করো আমার হালের উপর, করিম।
তোমারই নাম রহমান ও রহিম।
তুমিই দুই জগতের সুলতান।
পৃথিবীতে প্রকাশ পায় তোমারই 'শান'।
মিটে যাবে সব কারবার।
তোমারই করুণা -থাকবে বজায়।
প্রেমী-ভক্তের সদাই তুমি সহায়।

এবার পিল্লে জিজ্ঞাসা করেন- "ঐ কাকটি কখন এসে ঠোকর মারবে?" বাবা উত্তর দেন- "আরে, তুমি কি কাকটাকে দেখলে না? ও আর আসবে না। আব্দুল, যে তোমার পা চেপে দিলো, ঐ সেই কাক। ও ঠোকর মেরে তোমার ঘায়ের পোকা বার করে দিয়েছে। ও আর কেন আসবে? এবার গিয়ে বিশ্রাম করো। তুমি শীঘ্রই সুস্থ হয়ে যাবে।"

খানিকটা উদী কপালে লাগিয়ে এবং কিছুটা জলে মিশিয়ে খেয়ে,

কোন ওষুধ বা চিকিৎসা না করেই, উনি দশ দিনেই সুস্থ ও নীরোগ হয়ে ওঠেন- বাবা ওঁকে যেমনটি কথা দিয়েছিলেন।

শামার ছোট ভাইয়ের বৌ ঃ-

শামার ছোট ভাই বাপাজী সাঁওলী বিহীরের কাছে থাকতেন। একবার ওঁর স্ত্রীর খুব জ্বর হয় ও দুটো প্লেগের গাঁট বেরিয়ে আসে। বাপাজী দৌড়ে শামার কাছে আসেন এবং সাহায্যের জন্য তাঁর সঙ্গে যেতে বলেন। শামা ভয়ভীত হয়ে চিন্তায় পড়ে যান। নিজের নিয়ম অনুসারে, বাবার কাছে গিয়ে প্রণাম করে সাহায্যর জন্য প্রার্থনা করেন এবং ভাইয়ের বাড়ী যাওয়ার জন্য অনুমতি চান। বাবা বলেন- "এত রাত্তির হয়ে গেছে, এখন এই সময় কোথায় যাবে? শুধু উদী পাঠিয়ে দাও। জ্বর বা গাঁটের চিন্তা কেন করছ? ভগবান তো আমাদের পিতা ও প্রভু। ও শীঘ্রই সুস্থ হয়ে যাবে। এখন যেও না। ভোরবেলা গিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।"

শামার তো 'উদী'র উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। বাপাজী সেটা নিয়ে গিয়ে খানিকটা গাঁটের ও কপালে লাগিয়ে দেন ও খানিকটা জলে গুলে রোগীকে খাইয়ে দেন। ওটা খেতেই, রোগীর ঘাম বেরোতে শুরু করে এবং জ্বর কমতেই সে আরামে ঘুমিয়ে পড়ে। পরের দিন, বাপাজী নিজের স্ত্রীকে সুস্থ দেখে খুবই অবাক হয়ে যান - জ্বর ও গাঁট দুটোই উধাও। শামা বাবার আজ্ঞা নিয়ে পরের দিন সেখানে পৌঁছে, ভ্রাতৃবধূকে চা তৈরী করতে দেখে, অবাক হয়ে যান। ভাইকে জিজ্ঞাসা করাতে জানতে পারেন যে বাবার উদী রোগ সমূলে নষ্ট করে দিয়েছে। তখন শামা বাবার কথার মর্ম বুঝতে পারেন- "ভোরবেলা যেও এবং তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।"

চা খেয়ে শামা ফিরে আসেন। বাবাকে প্রণাম করার পর বলেন- "দেব! এ কি নাটক? আগে ঝড় তুলে আমাদের অস্থির করে দাও, তারপরেই আবার আমাদের সাহায্য করে, সব ঠিক করে দাও।" বাবা উত্তর দেন- "তুমি তো জানোই যে, কর্মপথ বড় রহস্যপূর্ণ। যদিও আমি কিছু করি না, তবুও লোকেরা আমাকেই কর্মের জন্য দায়ী ঠাওরায়। আমি শুধু একটি দর্শক বা সাক্ষীমাত্র। **কেবল ঈশ্বরই সর্বশক্তিমান এবং তিনিই প্রেরণা দেন। তিনি পরম দয়ালু। আমি ঈশ্বর বা মালিক কোনটাই নই। শুধু তাঁর এক আজ্ঞাবাহী সেবক এবং সব সময় তাঁকেই স্মরণ করি। যে নিরভিমান হয়ে নিজেকে কৃতজ্ঞ মনে করে, তাঁর উপর বিশ্বাস রাখে, তার কষ্ট দূর হয়ে যায় এবং সে মুক্তি লাভ করে।**

ইরাণী কন্যা ঃ-

এবার এক ইরাণী ভদ্রলোকের অভিজ্ঞতা পড়ুন। ওঁর ছোট মেয়ে ঘন্টায়-ঘন্টায় অজ্ঞান হয়ে যেত। হাত-পা শক্ত হয়ে মাটিতে পড়ে যেত। নানা চিকিৎসার কোন লাভ হয় না। কিছু লোক ঐ ইরাণী ভদ্রলোকের কাছে বাবার উদীর বিষয় অনেক প্রশংসা করেন। তাঁরা জানান- "ভিলে পার্লেতে (বম্বে) কাকাসাহেব দীক্ষিতের কাছে উদী পেতে পারেন।" তখন উনি সেখান থেকে উদী এনে জলে গুলে মেয়েকে খাওয়ান। প্রথমে যে মূর্ছা এক ঘন্টা অন্তর হত, পরে সেটা সাত ঘন্টা অন্তর হয় এবং কিছুদিন পর সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে।

হরদার এক ভদ্রলোক ঃ-

হরদার এক ভদ্রলোকের পাথুরী রোগ ধরা পড়ে। এই পাথর সাধারণতঃ অস্ত্রোপচার করেই বার করা যেতে পারত। লোকেরাও ওঁকে সেই পরামর্শ দেয়। কিন্তু উনি খুবই দুর্বল ও বৃদ্ধ ছিলেন এবং তাই অস্ত্রোপচার করাবার সাহস হচ্ছিল না। এই অবস্থায় ওঁর কষ্ট কিভাবে লাঘব হতে পারত? ঐ সময় শহরের 'ইনামদার' সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং ওঁর কাছে উদীও ছিল। কিছু বন্ধুদের পরামর্শে, ভদ্রলোকটির ছেলে ইনামদারের কাছ থেকে খানিকটা উদী নিয়ে এসে জলে গুলে, নিজের বৃদ্ধ পিতাকে খাইয়ে দেয়। কেবল পাঁচ মিনিটে, উদী পেটে যেতেই, পাথর মল-মূত্রেন্দ্রিয় দ্বার থেকে বেরিয়ে যায়। বৃদ্ধটি সত্বর আরোগ্য লাভ করলেন।

বম্বের মহিলার প্রসব-পীড়া ঃ-

বম্বের কায়স্থ প্রভু জাতির এক মহিলার প্রসব কালে অসহ্য যন্ত্রণা হত। গর্ভবতী হলেই উনি ঘাবড়ে যেতেন এবং দিশেহারা হয়ে পড়তেন। ওঁর স্বামীর এক বন্ধু, শ্রীরাম মারুতি তাঁকে পরামর্শ দেন- "যদি এই ব্যথা থেকে মুক্তি চাও, তো নিজের স্ত্রীকে শিরডী নিয়ে যাও।"

এরপর যখন মহিলা গর্ভবতী হন, তখন দুজনে শিরডী যান এবং সেখানে কয়েক মাস থাকেন। ওঁরা বাবার রোজ সেবা করতেন এবং তাঁর সৎসঙ্গের সৌভাগ্য লাভ করেন। কিছু দিন পর, মহিলার প্রসব কাল উপস্থিত হল এবং আগের মত গর্ভাশয়ের দ্বারে বাধা পাওয়ার দরুণ, খুব বেশী যন্ত্রণা শুরু হয়। কিছুক্ষণ পর এক প্রতিবেশী মহিলা আসেন এবং মনে-মনে বাবার কাছে সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করে

জলে উদী মিলিয়ে, মহিলাটিকে খাইয়ে দেন। এরপর পাঁচ মিনিটের মধ্যে, আর কোন কষ্ট না হয়ে প্রসব সম্পন্ন হয়। মৃতজাত বালক তো নিজের ভাগ্য অনুসারেই জন্মাল, কিন্তু ওর মা যন্ত্রণা ও কষ্ট থেকে মুক্তি পেয়ে বাবার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ হয়ে ছিলেন।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

অধ্যায় - ৩৫

কাকা মহাজনীর বন্ধু এবং 'শেঠ' (মনিব), নির্বীজ মনক্কা, বান্দ্রার এক গৃহস্থের অনিদ্রা, বালাজী পাটীল নেবাসকর, বাবার সর্প রূপে প্রকট হওয়া।

এই অধ্যায়েও উদীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। দুটি ঘটনার মাধ্যমে বাবাকে পরীক্ষা করার ভক্তের মন্তব্য এবং তাঁর অন্তহীন শক্তির বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমে এই ঘটনাগুলিই বর্ণনা করা হবে।

উপদলীয় মনোভাব আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে খুব বড় বাধা। নিরাকারবাদীদের বলতে শোনা যায় যে, ঈশ্বরের সগুণ উপাসনা শুধুমাত্র এক ভ্রম এবং সন্তগণ আমাদের মতনই সাধারণ মানুষ। তাই তাঁদের চরণ বন্দনা করে, দক্ষিণা দেওয়ার কি দরকার? অন্য পন্থের অনুগামীদেরও ঐ একই মত যে, নিজের সদ্‌গুরু ছাড়া অন্য সন্তদের নমন এবং ভক্তি করা উচিত নয়। এই ধরনের অনেক আলোচনা শ্রীসাই বাবার সম্বন্ধে আগে শোনা যেত এবং এখনো শোনা যায়। কেউ-কেউ বলত- "আমরা যখন শিরডী যাই, বাবা আমাদের কাছে দক্ষিণা চান। এই ভাবে দক্ষিণা চাওয়া কি একজন সাধুর পক্ষে শোভনীয়? যখন তিনি এরকম আচরণ করেন, তখন তাঁর সাধু ধর্ম কোথায় যায়?" কিন্তু এমনও দেখা গেছে যে যারা মনে অবিশ্বাস নিয়ে বাবার দর্শন করতে গেছে, তারাই সর্বপ্রথম বাবাকে গিয়ে প্রণাম করেছে। নীচে এমনিই কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হচ্ছে -

কাকা মহাজনী বন্ধু ঃ-

কাকা মহাজনীর এক নিরাকারবাদী বন্ধু মূর্তি-পূজার একেবারেই বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু কৌতূহলবশতঃ উনি কাকার সাথে দুটি শর্তে শিরডী যেতে প্রস্তুত হন যে, প্রথমতঃ বাবাকে প্রণাম করবেন না আর দ্বিতীয়তঃ তাঁকে কোন দক্ষিণা দেবেন না। যখন কাকা এতে রাজী হন, তখন ওঁরা দুজনে শনিবার রাতে বম্বে থেকে রওনা হয়ে পরের দিন সকালে শিরডী পৌঁছন। মস্‌জিদে পা রাখতেই বাবা কাকার বন্ধুর দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেন- "আরে আসুন! বসুন।" বাবার স্বরটি ছিল অবিকল বন্ধুটির স্বর্গীয় পিতার মতন। তখন ওঁর নিজের (স্বর্গীয়) পিতার কথা মনে পড়ে, এবং উনি আনন্দে বিভোর হয়ে ওঠেন। কি মনোমুগ্ধকর ছিল সেই স্বর? তৎক্ষণাৎ নিজের শর্তের কথা ভুলে, বাবার পদতলে মাথাটি রাখেন। বাবা দু'বার কাকার কাছে দক্ষিণা চান, বন্ধুটির কাছে নয়। উনি আশ্চর্য্য হয়ে কাকাকে ফিস্-ফিস্ করে বলেন- "ভাই, দেখো, বাবা তোমার কাছে, দুবার দক্ষিণা চাইলেন। কিন্তু আমিও তো তোমার সঙ্গেই আছি, তবে তিনি আমায় এইরূপ উপেক্ষা কেন করছেন?" কাকা উত্তর দেন- "ভালো হয়, যদি তুমি নিজেই বাবাকে জিজ্ঞাসা করো।" বাবা জিজ্ঞাসা করেন- 'কি কানাঘুষো চলছে?' তখন বন্ধুটি বলেন- "আমিও কি আপনাকে দক্ষিণা দিতে পারি?" বাবা বললেন- "তোমার অনিচ্ছা দেখে আমি তোমার কাছে দক্ষিণা চাইনি। কিন্তু তোমার যদি ইচ্ছে থাকে, তাহলে তুমি দক্ষিণা দিতে পারো।" তখন বন্ধুটি বাবাকে সতেরো টাকা দেন, ঠিক যতটা কাকা দিয়েছিলেন। তখন বাবা ওঁদের উপদেশ দিয়ে বলেন- **"আমাদের মধ্যে যে তেলীর (তেল ও জল কখনো মেশে না) দেওয়াল (ভেদ বুদ্ধি) আছে,**

সেটা নষ্ট করে দাও, যাতে আমরা পরস্পরকে দেখে, নিজেদের মিলনের পথ সুগম করতে পারি।" বাবা ওঁদের ফেরার অনুমতি দিয়ে বলেন- "তোমাদের যাত্রা সফল হবে।" যদিও আকাশে মেঘ করেছিল, তবুও ওঁরা নিরাপদে বম্বে পৌঁছে যান। বাড়ী ফিরে বন্ধুটি দরজা - জানালা খুলতেই দুটো মৃত চামচিকে দেখতে পান। তৃতীয়টি ওর সামনে দিয়ে উড়ে যায়। তখন ওঁর এই ভেবে খুব অনুতাপ হয় যদি তিনি জানালা খুলে যেতেন তাহলে, ঐ জীবগুলির প্রাণ বেঁচে যেত। কিন্তু পরক্ষণেই ওঁর মনে হয় যে, এ সব ওদের ভাগ্যানুসারেই ঘটেছে এবং বাবা তৃতীয়টির প্রাণ রক্ষা করার জন্যই, তাঁদের তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরত পাঠিয়ে দেন।

কাকা মহাজনীর মনিব

বম্বেতে 'ঠক্কর ধরমসী জেঠাভাই সলিসিটার (Legal Solicitor) নামে এক ফার্ম ছিল। কাকা এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক ছিলেন। কাকা ও তাঁর মনিবের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ খুব ভাল ছিল। শ্রীমান ঠক্কর জানতেন যে কাকা প্রায় শিরডী যান এবং সেখানে কিছুদিন থেকে বাবার অনুমতি হলেই ফেরেন। কৌতুহলবশতঃ বাবাকে পরীক্ষা করার বিচার নিয়ে, উনিও দোল-উৎসবের উপলক্ষে কাকার সাথে শিরডী যাবেন স্থির করেন। যেহেতু কাকার শিরডী থেকে ফেরার দিন অনিশ্চিত থাকত, তাই সাথে আরেক বন্ধুকে নিয়ে, তিনজনে রওনা হন। পথে কাকা বাবাকে অর্পণ করার জন্য দু সের মনক্কা কেনেন। ঠিক সময়ে শিরডী পৌঁছে, ওঁরা বাবার দর্শন করার জন্য মস্‌জিদে যান। বালাসাহেব তর্খডও সেই সময় মস্‌জিদেই ছিলেন। শ্রী ঠক্কর ওঁকে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বালাসাহেব উত্তর

দেন- "আমি দর্শন করতে এসেছি। আমার কোন চমৎকার দেখার প্রয়োজন বা ইচ্ছে নেই। এখানে তো ভক্তদের মনের ইচ্ছে পূরণ হয়।" কাকা বাবাকে প্রণাম করে, মনক্কা অর্পণ করেন। তখন বাবা সেগুলি বিতরণ করার আদেশ দেন। শ্রীমান ঠক্করও কয়েকটা মনক্কা পান। একে তো ওঁর মনক্কা ভালো লাগত না, উপরন্তু এরকম অপরিস্কার ভাবে খেতে ডাক্তার মানা করেছিল। তাই উনি কিছু স্থির করে উঠতে পারেন না এবং ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও সেগুলি গ্রহণ করতে হয়। ভদ্রতা রক্ষার্থে মুখেও পুরে নেন। এবার বীচিগুলো কি করা যায়-সেটা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। মস্‌জিদে মেঝেতে ফেলা যায় না। তাই উনি বীচিগুলো অনিচ্ছা সত্যেও নিজের পকেটে পুরে নেন। উনি ভাবেন- "বাবার মত সন্তর কাছে এই কথা কি করে অজানা থাকতে পারে যে, আমার মনক্কা ভালো লাগে না? তাহলে কি উনি আমায় এই বিষয়ে বাধ্য করতে পারেন?" এই চিন্তা মনের মধ্যে আসতেই বাবা ওঁকে আরো কয়েকটা মনক্কা দেন। কিন্তু উনি সেগুলি না খেয়ে হাতে ধরে বসে থাকেন। তখন বাবা ওঁকে সেগুলি খেয়ে ফেলতে বলেন। উনি সে আজ্ঞা পালন করেন এবং চিবিয়ে দেখেন যে, সবগুলি নির্বীজ- চমৎকার দেখার ইচ্ছে নিয়ে এসেছিলেন, তাই চমৎকার দেখতে পান। এও বুঝতে পারেন যে, বাবা সমস্ত চিন্তাধারা অবিলম্বে জেনেই ওঁর ইচ্ছানুসারে, সেগুলি নির্বীজ করে দিলেন। তাঁর কি অদ্ভুত শক্তি? তারপর সন্দেহ দূর করার জন্য উনি তর্খডকে, যিনি ওঁর পাশেই বসেছিলেন এবং কয়েকটা মনক্কাও পেয়েছিলেন, জিজ্ঞাসা করেন- "তুমি কি রকমের মনক্কা পেলে?" উত্তর পান- "বীচিওয়ালা।" শ্রীমান ঠক্কর তখন আরো অবাক হয়ে যান। উনি মনে-মনে স্থির করেন যে, যদি বাবা প্রকৃতপক্ষে সন্ত হন, তাহলে এবার সর্বপ্রথম মনক্কা কাকাকে দেওয়া হবে। এই

চিন্তাটি জানতে পেরে, বাবা বলেন- "এবার কাকার থেকে বিতরণ শুরু করো।" এই সব প্রমাণ, শ্রী ঠক্করের জন্য পর্যাপ্ত ছিল।

এরপর শামা বাবার সাথে শ্রী ঠক্করের পরিচয় করিয়ে বলেন- "ইনি কাকার মালিক।" বাবা বলেন- "ইনি কাকার মালিক কি করে হতে পারেন? ওঁর মালিক তো অন্য আরেকজন।" কাকা এই উত্তরে সম্মত ছিলেন। নিজের জেদ ছেড়ে, শ্রী ঠক্কর বাবাকে প্রণাম করে, সেখান থেকে চলে যান। দুপুরের আরতি শেষ হওয়ার, পর বাবার কাছে রওনা হওয়ার অনুমতি নেওয়ার জন্য মস্‌জিদে আসেন। শামা ওদের জন্য একটু সুপারিশ করাতে বাবা বলেন -

"একজন সন্দেহবাতিকগ্রস্ত ভদ্রলোক স্বাস্থ্যবান ও ধনী - দুই-ই ছিলেন। শারীরিক ও মানসিক পীড়া হতে মুক্ত থাকা সত্ত্বেও উনি সর্বক্ষণ অনাবশ্যক চিন্তাতে ডুবে থাকতেন ও অশান্ত মনে এখানে-ওখানে বৃথা ঘুরে বেড়াতেন। ওঁর এরকম দশা দেখে আমার দয়া হয় এবং আমি ওঁকে বলি যে, দয়া করে **আপনি নিজের বিশ্বাস এক স্থানে স্থির করুন। এরকম উদ্দেশ্যহীন হয়ে ঘুরে বেড়িয়ে কোন লাভ হবে না।"**

"শীঘ্রই একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্থির করো" - এই শব্দগুলি শুনে ঠক্কর তক্ষুনি বুঝে যান যে সেটি ওঁরই কাহিনী। ওঁর ইচ্ছে ছিল যে, কাকাও ওঁর সঙ্গে বম্বে ফিরুন। বাবা ওঁর সেই ইচ্ছে জেনে, কাকাকে তাঁর শেঠের সাথে ফিরে যাওয়ার আদেশ দেন। কেউ বিশ্বাসই করতে পারছিল না যে, কাকা এত তাড়াতাড়ি শিরডী থেকে ফিরতে পারবেন। এই ভাবে শ্রী ঠক্কর, বাবার অন্তর্যামী হওয়ার, আরেকটা প্রমাণ পান।

বাবা কাকার কাছে পনেরো টাকা দক্ষিণা চেয়ে বলেন- "আমি যদি কারো কাছ থেকে এক টাকাও দক্ষিণা নিই, তাহলে তাকে তার দশ গুণ ফিরিয়ে দিই। আমি কারো কোন বস্তু বিনামূল্যে নিই না আর সবার কাছে চাইও না। যাঁর দিকে ফকির (ঈশ্বর) ইঙ্গিত করেন, শুধু তার কাছেই চাই এবং যে গত জন্মের ঋণী, তারই দক্ষিণা স্বীকার করি। **দানী দেয় এবং ভবিষ্যতে সুন্দর ফলের বীজরোপন করে।** ধর্মের পথে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই, অর্থের প্রয়োগ হওয়া উচিত। টাকা যদি শুধু ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যয় করা হয়, তাহলে সেটা তার অপব্যবহার। যদি তুমি পূর্বজন্মে দান না করে থাকো, তো এই জন্মে কিছু পাওয়ার আশা কি করে করো? তাই **যদি পাওয়ার আশা থাকে, তো এখন দান করো।** দক্ষিণা দিলে বৈরাগ্য বুদ্ধি বাড়ে এবং বৈরাগ্য প্রাপ্তি দ্বারা ভক্তি ও জ্ঞান বাড়ে। **একটা দাও, দশ গুণ পাও।"** এই কথা শুনে শ্রী ঠক্করও নিজের সংকল্প (দক্ষিণা না দেওয়ার) ভুলে, বাবাকে পনেরো টাকা অর্পণ করেন। উনি ভাবেন- "শিরডী এসে আমার ভালোই হয়েছে। সব সন্দেহ দূর হল, অনেক রকম শিক্ষা পেলাম।"

এই সব বিষয়ে বাবার কৌশল অদ্বিতীয় ছিল। যদিও তিনি সব কিছু করতেন, তবুও সব কিছু থেকে নির্লিপ্ত থাকতেন। যে প্রণাম করত এবং যে করত না, দুজনেই ছিল তাঁর কাছে সমান। তিনি কখনো কাউকে অবহেলা করেননি। ভক্তরা তাঁর পূজো করলে তিনি তাতে বিশেষরূপে প্রসন্ন হতেন না। কেউ তাঁকে উপেক্ষা করলে, তাতেও তাঁর কোন দুঃখ হত না। তাঁর সুখ-দুঃখের কোন অনুভূতিই ছিল না।

অনিদ্রা ঃ-

বান্দ্রার এক ভদ্রলোক অনেকদিন ধরে ঘুমোতে না পারার জন্য অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। যেই উনি ঘুমোতে চেষ্টা করতেন, সেই ওঁর স্বর্গীয় পিতা স্বপ্নে এসে বাজে ভাবে গালাগাল করতেন। তাতে ঘুম ভেঙ্গে যেত এবং রাত-ভোর অশান্তি অনুভব করতেন। প্রত্যেক রাতেই এই রকম হত। তাই উনি একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। একদিন বাবার এক ভক্তের সাথে পরামর্শ করেন, এই ব্যাপারে। সে বলে- "আমি তো সর্ব-পীড়া নিবারণী উদীকেই এর রামবাণ ঔষধি মনে করি।" উনি একটা উদীর পুরিয়া দিয়ে বলেন- "এটা শোবার আগে কপালে লাগিয়ে, নিজের মাথার কাছে রেখো।" তারপর থেকে ভদ্রলোক নির্বিঘ্নে গভীর নিদ্রার আনন্দ উপভোগ করতেন। উনি শীঘ্রই শ্রীসাই বাবার ধ্যান করতে শুরু করেন। বাজার থেকে বাবার একটা ছবি এনে নিজের মাথার কাছে রেখে, নিত্য পূজো করা শুরু করেন। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার, মালা ও নৈবেদ্য অর্পণ করতেন। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে আগেকার সব কষ্ট ভুলে যান।

বালাজী পাটীল নেবাসকর ঃ-

ইনি বাবার একজন বড় ভক্ত ছিলেন ও বাবার নিষ্কাম সেবা করতেন। দিনের বেলা যে রাস্তা দিয়ে বাবা যেতেন, সেই রাস্তাটি সকাল-সকাল ঝাড়ু লাগিয়ে ভালো ভাবে পরিষ্কার করে রাখতেন। ওঁর পর এই কাজটি বাবার এক পরম ভক্ত রাধাকৃষ্ণমাঈ করতেন এবং তারপর আব্দুল। বালাজী ফসল কেটে সে সব শষ্য আগে বাবাকে অর্পণ করতেন। তার মধ্যে থেকে বাবা ওঁকে যতটা ফিরিয়ে দিতেন, সেটা দিয়েই উনি নিজের পরিবারের ভরন-পোষণ করতেন।

এই ব্যবস্থা অনেক বছর পর্যন্ত চলে এবং ওঁর মৃত্যুর পরও, ওঁর ছেলে সেটা বজায় রেখেছে।

উদীর শক্তি ও মাহাত্ম্য ঃ-

একবার শ্রী বালাজীর বার্ষিক শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ ভোজনের আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু ভোজনের সময় দেখা গেল তিনগুণ লোক এসেছে। শ্রীমতি নেবাসকর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। উনি ভাবেন যে, সেই খাবার সবার জন্য পর্যাপ্ত হবে না এবং কম পড়ে গেলে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে নিন্দের পাত্র হতে হবে। তখন ওঁর শাশুড়ী ওঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন- "চিন্তা করো না। এই অন্ন আমাদের নয়, এইটি তো শ্রীসাই বাবার। প্রত্যেক পাত্রে উদী ঢেলে, সেটি কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও এবং কাপড় না সরিয়েই সকলকে পরিবেশন করো। বাবা আমাদের মুখ রক্ষা করবেন।" পরামর্শ অনুসারে, সেই রকমই করা হয়। লোকেদের পেট ভরে ও তৃপ্তি সহকারে খাওয়ানোর পরও, খাদ্য সামগ্রী যথেষ্ট মাত্রায় বেঁচে যায় এবং তা দেখে সবাই খুব আশ্চর্য্য ও প্রসন্ন হয়। আসলে যার যে রকম মনোভাব হয়, সেরকমই হয় তার অনুভূতি। এমনি একটি ঘটনা প্রথম শ্রেণীর উপন্যায়াধীশ শ্রী বি. এ. চৌগুলে আমায় বলেছিলেন। ১৯৪৩ সালে ফেব্রুয়ারীতে করজতে (জেলা আহমদনগর) পূজোর উৎসব চলছিল এবং একটি বিরাট ভোজের আয়োজন করা হয়। খাবার সময়, আমন্ত্রিত লোকেদের সংখ্যার চেয়ে, পাঁচগুণ বেশী লোক এসে উপস্থিত হয়। তবুও খাদ্য সামগ্রী কম পড়ে না। বাবার কৃপায় সবাই-ই খেতে পায় এবং তাই দেখে সবার খুব আশ্চর্য্য লাগে।

সাইবাবার সর্প রূপে প্রকট হওয়া ঃ-

শিরডীর রঘু পাটীল একবার নেবাসে বালাজী পাটীলের বাড়ী যান। সেখানে পৌঁছে জানতে পারেন যে সন্ধ্যাবেলায় একটা সাপ ফোঁস-ফোঁস করতে করতে, গোশালায় ঢুকে গেছে। সব পশুগুলি ভয় পেয়ে পালাতে চেষ্টা করছে। বাড়ীর লোকেরাও ঘাবড়ে গিয়েছিল। কিন্তু বালাজী মনে করেন যে, শ্রীসাই-ই এই রূপে এখানে প্রকট হয়েছেন। তখন উনি একটা বাটিতে দুধ এনে নির্ভয়ে ঐ সাপটির সামনে রেখে ওকে সম্বোধন করে বলেন- "বাবা, আপনি ফোঁস করে হৈ-চৈ কেন বাঁধাচ্ছেন? আপনি কি আমায় ভয় পাওয়াতে চান? শান্ত হয়ে এই দুধ পান করুন।" এই বলে কোনরকম ভয় না পেয়ে, সাপটির কাছেই বসে পড়েন। অন্যান্য সদস্যরা ঘাবড়ে গিয়ে কি যে করবেন, বুঝে উঠতে পারছিলেন না। কিন্তু একটু পরেই সাপটি অদৃশ্য হয়ে যায় এবং কেউ জানতেও পারে না যে, ও কোথায় গেল। গোশালায় সর্বত্র খোঁজার পরও, সেখানে তার কোন হদিশ পাওয়া যায় না।

।। শ্রী সাইনাথার্পণমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

সপ্তাহ পারায়ণ ঃ পঞ্চম বিশ্রাম

অধ্যায় - ৩৬

আশ্চর্য্যজনক ঘটনা - ***১) গোয়ার দুজন ভদ্রলোক ২) শ্রীমতি ঔরাঙ্গাবাদকর***

এই অধ্যায়তে গোয়ার দুই ভদ্রলোক ও শ্রীমতি ঔরাঙ্গাবাদকরের অদ্ভুত গল্প বর্ণনা করা হচ্ছে।

গোয়ার দুই মহানুভব ঃ-

এক সময় গোয়া থেকে দুইজন ভদ্রলোক শ্রী সাইবাবাকে দর্শন করতে শিরডী আসেন। ওঁরা দুজনে বাবাকে প্রণাম করেন। যদিও তাঁরা একসাথেই এসেছিলেন, তবুও বাবা শুধু একজনের কাছেই দক্ষিণা চান এবং সে সানন্দে সেটি দিয়ে দেয়। অন্যজনও তাঁকে ৩৫ টাকা দক্ষিণা দিতে চাইলেন, কিন্তু বাবা ওঁর দক্ষিণা ফিরিয়ে দেন। লোকেরা খুব অবাক হয়। সে সময় শামাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। উনি বলেন- "দেব! এ কি? এঁরা দুজনে একসঙ্গেই এসেছেন। একজনের দক্ষিণা আপনি চেয়ে নিলেন আর অন্যজন যিনি স্বেচ্ছায় দিতে চাইছেন, তাঁরটা অস্বীকার করছেন? এই ধরনের পার্থক্যের ভাব কেন?" তখন বাবা উত্তর দেন- "শামা, তুমি অবোধ। আমি কারো কাছ থেকে কখনো কিছু নিই না। এখানে মস্‌জিদমাঈ নিজের ঋণ চান এবং তাই যে দেয়, সে নিজের ঋণ শোধ করে মুক্ত হয়ে যায়। আমার কি কোন ঘর, বাড়ী, সম্পত্তি বা ছেলে-পিলে আছে, যাদের জন্য আমার কোন চিন্তা হবে? আমার কোন বস্তুরই প্রয়োজন নেই। আমি চিরমুক্ত। ঋণ, শত্রুতা ও হত্যা, এদের প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যই করতে হয় এবং এগুলি থেকে অন্য কোন ভাবে

মুক্তি সম্ভব নয়।

"নিজের জীবনের প্রারম্ভে এই মহাশয় গরীব ছিলেন। ইনি ঈশ্বরের কাছে প্রতিজ্ঞা করেন যে, যদি চাকরী পেয়ে যান, তাহলে একমাসের মাইনে অর্পণ করবেন। ইনি পনেরো টাকা মাসিক বেতনের একটা চাকরী পান। তারপর একের-পর-এক উন্নতি হতে হতে ৩০, ৫০, ১০০, ২০০ এবং শেষে ৭০০ টাকা মাসিক বেতন হয়ে যায়। কিন্তু সমৃদ্ধি অর্জন করে, ইনি নিজের প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে যান এবং টাকাও অর্পণ করেন না। নিজের শুভ কর্মের প্রভাবে, এখানে পৌঁছবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। অতএব আমি এনার কাছে শুধু পনেরো টাকাই দক্ষিণা চাই - এঁর এক মাসের মাইনে।"

দ্বিতীয় কাহিনী ঃ-

"সমুদ্রের কাছে বেড়াতে-বেড়াতে, আমি এক প্রাসাদের কাছে গিয়ে পৌঁছই এবং তার দালানে একটু বিশ্রাম করতে বসি। এই প্রাসাদের ব্রাহ্মণ মালিক আমার যথোচিত আতিথেয়তা করে, আমায় সুস্বাদু খাবার খেতে দেয়। খাবার খাওয়ার পর ও আমায় আলমারীর কাছে শোওয়ার জন্য একটা পরিষ্কার জায়গা দেখিয়ে দেয় এবং আমি সেখানেই শুয়ে পড়ি। আমি যখন গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন, সেই সময় লোকটি পাথর সরিয়ে দেওয়ালে সিঁধ কেটে ঘরে ঢোকে এবং আমার পকেট কেটে সব টাকা বার করে নেয়। ঘুম থেকে উঠে দেখি যে, আমার তিরিশ হাজার টাকা চুরি গেছে। দুঃখে-কষ্টে আমি শুধু কাঁদতে থাকি। শুধু নোটই চুরি হয়েছিল, তাই আমার মনে হয় যে এ কাজ ঐ ব্রাহ্মণটি ছাড়া আর কারো হতে পারে না। আমার খাওয়া-পরার ইচ্ছে নষ্ট হয়ে যায়, এবং ওখানেই বসে-বসে চুরির

কথা ভেবে ভেবে, বুক চাপড়াতে থাকি। এই ভাবে পনেরো দিন কেটে যায়। একদিন এক ফকির রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি আমায় আমার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তখন আমি ওঁকে সব কথা জানাই। উনি তখন আমায় বলেন- "যদি তুমি আমার কথা মত কাজ করো তাহলে, তোমার হারানো টাকা ফেরত পেয়ে যাবে। আমি এক ফকিরের ঠিকানা তোমায় দিচ্ছি। তুমি তাঁর শরণে যাও এবং তাঁর কৃপায় তুমি তোমার হারানো টাকা ফিরে পাবে। কিন্তু যতদিন টাকা ফিরে না পাও, ততদিন নিজের কোন প্রিয় খাদ্য পরিত্যাগ করো।" আমি ঐ ফকিরের কথা মেনে নিই এবং আমার হারানো টাকা ফেরত পাই। এর কিছুদিন পর প্রাসাদ ছেড়ে সমুদ্রোপকূলে আসি। একটা জাহাজ দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু ভিড়ের জন্য উঠতে পারলাম না। সৌভাগ্যক্রমে, এক সদাশয় চাপরাশীর সাহায্যে, আমি জাহাজে বসার জায়গা পাই এবং অন্য পাড়ে পৌঁছতে পারি। সেখান থেকে ট্রেনে চড়ে শিরডী এসে পৌঁছাই।" কাহিনী শেষ হতেই, বাবা শামাকে ঐ অতিথি দুজনকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে, খাবার ব্যবস্থা করতে বলেন। তখন শামা এঁদের নিজের বাড়ী নিয়ে যান। খেতে-খেতে শামা ওঁদের বলেন- "বাবার কাহিনীটি বড়ই রহস্যপূর্ণ। তিনি কখনো সমুদ্রের দিকে যাননি আর তাঁর কাছে কখনো তিরিশ হাজার টাকাও ছিলো না। তিনি কখনো কোথাও যাননি এবং কোন টাকা কোনদিন চুরি হয়ে ফেরতও আসেনি।" তারপর শামা ওঁদের জিজ্ঞাসা করেন- "আপনারা কিছু বুঝলেন - এর অর্থ?" দুই অতিথিই নির্বাক এবং তাদের চোখ থেকে অঝরে জল পড়ছিল। ওরা কাঁদতে-কাঁদতে বলল- "বাবা তো সর্বব্যাপী, অনন্ত এবং পরমব্রহ্ম স্বরূপ। যে ঘটনাগুলি তিনি বলেছেন, সেগুলি আমাদেরই কাহিনী এবং আমাদের ক্ষেত্রেই ঘটেছে। এটা

খুব আশ্চর্য্যের কথা যে, তিনি সব কথা জানলেন কি করে? খাওয়াদাওয়ার পর সব বিস্তারিত বলব।

এরপর পান খেতে-খেতে ওরা নিজেদের ইতি কথা শুরু করে। প্রথমজন বলতে শুরু করে ঃ-

"এক পাহাড়ী এলাকায় আমাদের বাড়ী। আমি চাকরী খুঁজতে, গোয়া আসি। আমি ভগবান দত্তাত্রেয়কে কথা দিই - "যদি আমি চাকরী পেয়ে যাই, তাহলে আপনাকে এক মাসের মাইনে অর্পণ করব।" তাঁর কৃপায়, আমি পনেরো টাকা মাসিক বেতনের চাকরী পাই এবং যেমনটি বাবা একটু আগে বললেন, আমার উন্নতিও হয়। কিন্তু আমি নিজের প্রতিজ্ঞা ভুলে যাই। বাবা সেটা স্মরণ করিয়ে, আমার কাছ থেকে পনেরো টাকা নিয়ে নিলেন। আপনারা এটাকে দক্ষিণা মনে করবেন না। এটা একটা পুরনো ঋণ শোধ হল এবং দীর্ঘকাল ভুলে যাওয়া প্রতিজ্ঞা পালন।"

শিক্ষা ঃ-

যথার্থে বাবা কখনো কারো কাছে টাকা চাননি আর নাই নিজের ভক্তদের কখনো চাইতে দিয়েছেন। তিনি আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে কাঞ্চনকে বাধা মনে করতেন এবং সর্বদা তার জাল থেকে ভক্তদের বাঁচাতেন। ভগত্ ম্হালসাপতি এরই এক উদাহরণ। উনি খুবই গরীব ছিলেন এবং বড়ই অভাবে ওঁর দিন কাটত। বাবা ওঁকে কখনো টাকা চাইতে দিতেন না। তাঁর কাছে যে দক্ষিণা জমা হত, তার থেকেও ওঁকে কিছু দিতেন না। একবার এক দয়ালু ও উদারচেতা ব্যবসায়ী বাবার সামনেই, বেশ কিছু টাকা ম্হালসাপতিকে দিতে চাইলেন, কিন্তু বাবা ওঁকে সেটা গ্রহণ করতে দেন নি।

এবার দ্বিতীয় অতিথি নিজের কাহিনী বলতে শুরু করে। "আমার কাছে এক ব্রাহ্মণ রাঁধুনী ছিল, যে গত ৩৫ বছর থেকে নিষ্ঠাসহকারে আমার বাড়ীতে কাজ করছিল। কিন্তু বদভ্যাসে পড়ে, ওর মন পাল্টে যায় এবং ও আমার সব টাকা চুরি করে নেয়। আমার আলমারী দেওয়ালের সঙ্গে লাগানো থাকত এবং যখন আমরা ঘুমোচ্ছিলাম, ও পেছন থেকে পাথর সরিয়ে আমার তিরিশ হাজার টাকা চুরি করে নেয়। আমি জানি না যে, বাবা টাকার রাশিটা সঠিক কি করে জানতে পারেন। আমি দিন-রাত কাঁদতাম আর দুঃখ করতাম। একদিন যখন আমি এই ভাবেই নিরাশ ও উদাস হয়ে বারান্দায় বসেছিলাম, সেই সময় রাস্তা দিয়ে এক ফকির যাচ্ছিল। সে আমার দশা দেখে আমার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করায়, আমি ওকে সমস্ত কথা জানাই। তখন সে বলে- "কোপরগ্রাম তালুকে শিরডী নামে একটি জায়গায়, শ্রী সাইবাবা নামে এক সিদ্ধিপ্রাপ্ত ফকির থাকেন। তাঁকে কথা দাও এবং নিজের সবচেয়ে প্রিয় খাবার ত্যাগ করো। মনে-মনে সংকল্প করো- 'যতক্ষন আমি আপনার দর্শন না করব ততক্ষন ঐ প্রিয় খাদ্য একেবারেই খাবো না।" তখন আমি ভাত খাওয়া ছেড়ে দিই এবং বাবাকে কথা দিই- "বাবা, যতদিন না আমি আমার চুরি হওয়া টাকা ফেরত পাই এবং আপনার দর্শন করি, ততদিন আমি ভাত খাবো না।" এই ভাবে পনেরো দিন কেটে যায়। তারপর সেই রাধুনি নিজে এসে টাকা ফিরিয়ে, ক্ষমা চেয়ে বলে- "আমার বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আমি আপনার পায়ে পড়ছি। আমায় ক্ষমা করুন।" এই ভাবে সব ঠিক হয়ে যায়। আমাকে যিনি সাহায্য করেছিলেন তাঁর আর কোন দিন দেখা পাই নি। আমার মনে শ্রী সাইবাবার, যার বিষয় ফকির আমায় বলেছিলেন, দর্শন করার তীব্র আকাঙ্খা জাগল। আমার পরে মনে হয় যে, যে ফকিরটি আমার বাড়ীতে এসেছিলেন,

তিনি সাই বাবা ছাড়া আর কেউ নন। যিনি আমায় কৃপা করে দর্শন দেন এবং আমায় এইভাবে সাহায্য করেন, তাঁর ৩৫ টাকার প্রতি লোভ কিভাবে থাকতে পারে? বরং তিনি আমাদের পরমার্থ লাভের পথে পরিচালিত করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকেন।

"হারানো টাকা ফিরে পেয়ে আমার আনন্দের সীমা ছিল না। আনন্দে আত্মহারা হয়ে, নিজের প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে যাই। কোলাবাতে এক রাতে, স্বপ্নে সেই ফকিরকে দেখি। তখনই আমার শিরডী যাওয়ার সংকল্পের কথা মনে পড়ে। আমি গোয়া পৌঁছাই এবং সেখানে থেকে স্টীমারে চড়ে বম্বে হয়ে শিরডী যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু গিয়ে দেখি স্টীমারে খুব ভিড় - জায়গা নেই। ক্যাপ্টেন আমায় অনুমতি দেন না। কিন্তু এক অপরিচিত চাপরাশীর বলাতে, আমি স্টীমারে বসার অনুমতি পাই এবং এই ভাবে বম্বে পৌঁছাই। বাবা যে সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞ, এ বিষয়ে আমার কোন প্রমাণের দরকার নেই। দেখো তো, আমরা কে বা কোথায় আমাদের বাড়ী? আমাদের কত সৌভাগ্য যে, বাবা আমাদের হারানো টাকা ফেরত পাইয়ে, এখান অবধি টেনে আনলেন। **(আপনারা) শিরডী বাসীরা আমাদের চেয়ে সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ ও ভাগ্যবান। আপনারা বাবার সঙ্গে হাসেন, খেলেন, মধুর কথোপকথোন করেন এবং কত বছর ধরে তাঁর সঙ্গে থাকছেন। আপনাদের গত জন্মের অশেষ পুণ্য সঞ্চয়ের প্রভাবই বাবাকে এখানে টেনে এনেছে।**

শ্রী সাই-ই আমাদের দত্তাত্রেয়। তিনিই আমাদের দিয়ে প্রতিজ্ঞা করান এবং জাহাজে স্থান পাওয়ান। তারপর আমাদের এখানে এনে,

নিজের সর্বব্যাপকতার ও সর্বজ্ঞতার অনুভূতি দেন।"

শ্রীমতী ঔরাঙ্গাবাদকর ঃ-

সোলাপুরের সখারাম ঔরাঙ্গাবাদকরের স্ত্রীর ২৭ বছর অবধি কোন সন্তান হয়নি। সন্তান প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে অনেক দেবী দেবতার কাছে মানত্ করেন। কিন্তু তবুও ওঁর মনোস্কামনা পূরণ হয় না। তখন উনি একেবারে নিরাশ হয়ে শেষ চেষ্টা হিসেবে, নিজের সৎ-ছেলে শ্রী বিশ্বনাথকে নিয়ে শিরডী আসেন। সেখানে বাবার সেবায় দুমাস কাটান। যখনই উনি মস্জিদে যেতেন, তখনই বাবাকে সবসময়ই ভক্তদের দ্বারা পরিবেষ্ঠিত হয়ে থাকতে দেখতেন। ওঁর ইচ্ছে ছিল, বাবার সঙ্গে একান্তে দেখা করে সন্তান প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করবেন। কিন্তু কিছুতেই সেই সুযোগ আর হচ্ছিল না। শেষে শামাকে অনুরোধ করেন যে, "যখন বাবা একটু একান্তে থাকবেন, সেই সময় আমার জন্য একটু প্রার্থনা করো।" শামা বলেন- "বাবার তো 'খোলা দরবার'। তবুও তোমার যদি তাই ইচ্ছে, আমি নিশ্চয় চেষ্টা করব। কিন্তু কর্মের ফল, ঈশ্বরের হাতে ছাড়তে হবে। খাবার সময় তুমি মস্জিদের উঠানে, নারকেল ও ধূপ নিয়ে বসো। আমি ইশারা করতেই, উঠে দাঁড়িও।" একদিন খাবার খাওয়ার পর, শামা যখন বাবার হাত গামছা দিয়ে পুছে দিচ্ছিলেন, সেই সময় বাবা ওঁর গালে চিমটি কাটেন। তখন শামা একটু রেগে বলেন, "দেব! এ কি? এমনি করে আমার গালে চিমটি কাটাটা কি তোমার উচিত? এই ধরনের দুষ্টু দেবতার আমাদের একেবারেই দরকার নেই। আমরা তোমার উপর আশ্রিত। তবে কি আমাদের ঘনিষ্ঠতার এই ফল?" বাবা বলেন- "আরে, তুই গত ৭২ জন্ম থেকে আমার সঙ্গে আছিস। আমি এর আগে তোকে কখনো চিমটি কাটিনি। তুই আমার স্পর্শে রেগে উঠছিস্ কেন?" শামা বলেন-

"আমাদের তো এমন দেব চাই যে, আমাদের সব সময় আদর করবে এবং নিত্য নতুন ভালো-ভালো জিনিষ খাওয়াবে। আমরা তোমার কাছে তো কোন সম্মান চাইছিনা, স্বর্গ ইত্যাদির সুখও চাই না। আমাদের ভক্তি-বিশ্বাসটুকু সর্বদা তোমার চরণে আশ্রিত থাকুক, এই চাই।" তখন বাবা বলেন- "হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস। সেই জন্যই তো এসেছি। আমি জন্ম-জন্মান্তর থেকে তোর ভরন-পোষন করছি, তাই তোকে বেশী স্নেহ করি।"

বাবা নিজের গদির উপর বসতেই, শামা ঐ স্ত্রীটিকে ইঙ্গিত করেন। ও উপরে এসে, বাবাকে প্রণাম করে তাঁকে নারকেল ও ধূপ অর্পণ করে। বাবা নারকেলটি নাড়িয়ে দেখেন ও শামাকে বলেন- "এটা তো ভেতরে নড়ছে। শোন্ তো কি বলছে?" শামা বলেন- "এই 'বাঈ' প্রার্থনা করছে যে, ঠিক এই রকম এঁর পেটেও যেন একটি সন্তান গুড়গুড় করে। তাই ওঁকে আশীর্বাদ করে, এই নারকেলটি ফিরিয়ে দাও।" তখন আবার বাবা বলেন- "নারকেল দিলে কি কখনো বাচ্চা হয়? লোকেদের কিসব মূর্খের মত ধারণা?" শামা বলেন- "আমি খুব ভালোভাবে তোমার কথা ও আশিসের শক্তির সাথে পরিচিত। তোমার একটা শব্দেই, এই বাঈয়ের পর পর ছেলে হতে শুরু করবে। তুমি কেবল কথা এড়াতে চাইছো, আশীর্বাদ দিচ্ছ না।" এই ভাবে কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটি চলল। বাবা বারবার নারকেলটা ভেঙ্গে ফেলতে বলছিলেন, কিন্তু শামার সেই জেদ- 'এটা বাঈকে ফেরত দিন।' শেষে বাবাকে বলতেই হয়, "এঁর সন্তান হবে।" তখন শামা জিজ্ঞাসা করেন- "কতদিনের মধ্যে?" বাবা উত্তর দেন- "এক বছরের মধ্যে।" এবার নারকেলটা ভেঙ্গে তার দুটো টুকরো করা হলো। একটা ভাগ তাঁরা দুজনে খেলেন এবং অন্য ভাগটি ঐ স্ত্রীটিকে

দিলেন। তখন শামা ঐ মহিলাটিকে বলেন- "প্রিয় বোন! তুমি আমার প্রতিজ্ঞার সাক্ষী। যদি ১২ মাসের মধ্যে তোমার সন্তান না হয়, তাহলে আমি এই দেবের মাথার উপর নারকেল ভেঙ্গে, তাঁকে এই মস্‌জিদ থেকে বার করে দেব। যদি তা না করতে পারি, তাহলে আমার নাম 'মাধব' নয়। আমি যা-যা বললাম, তার অর্থ তুমি খুব শীঘ্রই বুঝতে পারবে।"

এক বছরের মধ্যেই মহিলাটি পুত্ররত্ন প্রাপ্ত করেন। পাঁচ মাসের শিশুকে নিয়ে, নিজের স্বামীর সঙ্গে বাবার শ্রীচরণে উপস্থিত হন। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বাবাকে প্রণাম করেন এবং কৃতজ্ঞ পিতা (শ্রীমান ঔরাঙ্গাবাদকর) পাঁচশো টাকা বাবাকে অর্পণ করেন। এই টাকাটি শ্যামকর্ণের (বাবার ঘোড়া) ঘরের ছাদ তৈরী করার কাজে লাগে।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

অধ্যায় - ৩৭

চাওড়ী শোভাযাত্রা

এই অধ্যায়ের শুরুতে বেদান্তের কোন কোন বিষয়ের উপর আলোকপাত করে হেমাডপন্ত 'চাওড়ী'র অপূর্ব শোভাযাত্রা বর্ণনা করেছেন।

প্রারম্ভ ঃ-

ধন্য শ্রীসাই, যাঁর যেমন জীবন তেমনি অবর্ণনীয় লীলাবিলাস এবং অদ্ভুত কার্য্যকলাপে ভরা তাঁর দৈনিক কর্মসূচী। কখনো তো তাঁকে সমস্ত সাংসারিক কর্ম থেকে নির্লিপ্ত থেকে কর্মকাণ্ডীর ন্যায় মনে হত। আবার কখনো তিনি ব্রহ্মানন্দে ও আত্মজ্ঞানে নিমগ্ন থাকতেন। যদিও কখনো-কখনো তাঁকে দেখে পূর্ণ নিষ্ক্রিয় মনে হত, তবুও তিনি অলস ছিলেন না। প্রশান্ত মহাসাগরের ন্যায় সর্বদা গম্ভীর, শান্ত ও স্থির থাকতেন। তাঁর প্রকৃতি বা স্বভাব বর্ণনা করা আমাদের সামর্থের বাইরে। তিনি পুরুষদের ভাই-য়ের মতো এবং নারীদের মা-য়ের বা বোনের মতো দেখতেন। সকলেই জানে তিনি ছিলেন চিরকুমার ও প্রকৃত ব্রহ্মচারী। তাঁর সৎসঙ্গে আমরা যে অনুপম জ্ঞান উপলব্ধি করেছি, তার বিস্মৃতি যেন মৃত্যু পর্য্যন্ত না হয়- তাঁর শ্রীচরণে আমাদের এই বিনম্র প্রার্থনা। প্রতিটি জীবের মধ্যে তাঁকে দর্শন করে, নাম স্মরণের রসানুভূতিতে নিমগ্ন হয়ে যেন, তাঁর মোহবিনাশক চরণের অনন্যরূপে সেবা করতে পারি, এই আমাদের আকাঙ্খা। হেমাডপন্ত নিজের মত অনুসারে বেদান্তের কিছু অংশের বিবরণ দিয়ে তার পর

'চাওড়ী' শোভাযাত্রার বর্ণনা আরম্ভ করছেন।

চাওড়ী শোভাযাত্রা ঃ-

বাবার শয়নকক্ষের বর্ণনা আগেই করা হয়েছে। তিনি একদিন মস্‌জিদে ও পরের দিন 'চাওড়ী'তে শুতেন। এই নিয়ম চলে তাঁর মহাসমাধি পর্যন্ত। 'চাওড়ী'তে নিয়মিত রূপে ভক্তরা তাঁর পূজা-অর্চনা ১০ই ডিসেম্বর, ১৯০৯ সাল থেকে শুরু করে দিয়েছিল। এবার তাঁর শ্রীচরণের ধ্যান করে, আমরা 'চাওড়ী' শোভাযাত্রা বর্ণনা শুরু করব। এত মনোহর ছিল সেই দৃশ্য যে, ভক্তরা বিস্ময়বিহ্বল হয়ে যেত। বোধশক্তি হারিয়ে এই কামনাই করত যে, সেই দৃশ্য যেন কখনো তাদের দৃষ্টি থেকে আড়াল না হয়। 'চাওড়ী'তে বিশ্রাম করার পালা এলে, সেই রাত্রিতে ভক্তদের দল মস্‌জিদের সভা-মণ্ডপে জমায়েত হয়ে, ঘন্টার-পর-ঘন্টা ভজন করত। সেখানেই একদিকে সুসজ্জিত রথ রাখা থাকত এবং অন্য দিকে তুলসী বৃন্দাবন। সঙ্গীতরসিক ভক্তরা সভা-মণ্ডপে করতাল, মৃদঙ্গ, কানজিরা, ঢোল ইত্যাদি বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র নিয়ে ভজন শুরু করে দিত। এই সব ভজনানন্দী ভক্তদের চুম্বকের মত আকর্ষিত শ্রীসাই বাবাই করতেন।

মস্‌জিদের প্রাঙ্গনে দেখো ভক্তরা কত উৎসাহের সাথে নানা রকমের মঙ্গলানুষ্ঠান করতে ব্যস্ত। কেউ প্রদীপ জ্বালাচ্ছে তো, কেউ পাল্কি এবং রথ সাজাচ্ছে। শ্রীসাই বাবার জয় জয়কার ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছে। প্রদীপের আলোতে ঝলমলে মস্‌জিদকে দেখে এমন মনে হচ্ছে যেন, মঙ্গলময়ী দীপাবলী স্বয়ং শিরডীতে বিরাজমান। মস্‌জিদের বাইরে দৃষ্টিপাত্ করলে দেখা যাবে যে, দ্বারে শ্রীসাই বাবার ঘোড়া শ্যামসুন্দর সুসজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এদিকে শ্রী সাইবাবা চুপ করে নিজের গদিতে বসে আছেন।

এমন সময় ভক্তদের সাথে তাত্য়া পাটীল এসে বাবাকে তৈরী হয়ে নিতে বলেন। তাঁকে হাত ধরে উঠতে সাহায্য করেন। অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হওয়ায়, তাত্য়া বাবাকে 'মামা' বলে ডাকতেন। বাবা কফ্নী পরে, বগলে ছোট লাঠিটা দাবিয়ে, ছিলিম ও তামাক নিয়ে কাঁধে একটা কাপড় রেখে প্রস্থান করার জন্য প্রস্তুত হলেন। তখন তাত্য়া পাটীল তাঁর কাঁধে একটা সোনালী জরির শাল রাখেন। এরপর বাবা ধুনি প্রজ্জ্বলিত রাখার জন্য নিজে তাতে কিছু কাঠ ঢেলে, ধুনির কাছে রাখা প্রদীপটি হাত দিয়ে নিভিয়ে, 'চাওড়ী' অভিমুখে রওনা হন। সঙ্গে-সঙ্গেই নানা রকমের বাদ্যযন্ত্র বাজতে শুরু করে। নানা রঙের আতশবাজী জ্বালানো শুরু হয়। স্ত্রী-পুরুষেরা বাদ্যযন্ত্রের সাথে তাঁর কীর্তির ভজন গাইতে-গাইতে তাঁর সামনে-সামনে চলছে। কেউ আনন্দে বিভোর হয়ে নৃত্য করছে তো, কেউ অনেক রকমের পতাকা ও নিশান নিয়ে চলেছে। যেই বাবা মস্জিদের সিঁড়িতে চরণ রাখেন, অমনি খালদাররা খুব উচ্চ স্বরে তাঁর প্রস্থান ঘোষণা করে। দুদিক দিয়ে লোকে চামর দিয়ে তাঁকে হাওয়া করছে। এরপর রাস্তার উপর দূর অবধি বেছানো কাপড়ের উপর দিয়ে শোভাযাত্রা এগোতে লাগল। তাত্য়া পাটীল বাবার বাঁ হাত এবং মহালসাপতি ডান হাত ধরে আছেন। বাপুসাহেব যোগ ছাতা নিয়ে চলছেন। এঁদের সামনে সুসজ্জিত ঘোড়া শ্যামসুন্দর চলেছে। পেছনে ভজন মণ্ডলী ও ভক্তদের সমূহ, বাদ্যধ্বনির সাথে সমস্বরে হরি ও সাইনাম করতে-করতে এগিয়ে চলেছে। এবার শোভাযাত্রা 'চাওড়ী'র কোণে এসে পৌঁছেছে। সবাই যেন এক অপার আনন্দ ও ঘন স্বর্গসুখে ডুবে আছে। বাবা যখন 'চাওড়ী'র সামনে এসে দাঁড়ান, তখন তাঁর মুখের দিব্যপ্রভা বড়ই অদ্ভুত মনে হচ্ছিল, যেন অরুণোদয়ের সময় উজ্জ্বল রশ্মির ছটা ছড়িয়ে

আছে। উত্তরের দিকে মুখ করে, তিনি এমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন যেন তিনি কারো আগমনের প্রতীক্ষা করছেন। বাদ্যযন্ত্র আগের মতই বেজে চলেছে এবং এই সময় কাকাসাহেব দীক্ষিত আবীরের বর্ষা করলেন। বাবার মুখমণ্ডলে এমন অপূর্ব রক্তিম আভা জ্বলজ্বল করে ওঠে যে, তা দেখে ভক্তদের হৃদয় উল্লসিত হয়ে উঠল। এই মনোহর দৃশ্য ও উৎসবের বর্ণনা শব্দে করার সামর্থ আমার নেই। ভাবে বিভোর হয়ে, ভগত্ ম্হালসাপতিও নাচছেন। কিন্তু বাবার অটল একাগ্রতা দেখে সবাই হতবাক। এক হাতে লণ্ঠন নিয়ে তাত্য়া পাটীল বাবার বাঁ দিকে এবং অলংকার ইত্যাদি নিয়ে মহালসাপতি ডান দিকে রয়েছেন। দেখো তো, কি অপরূপ এই শোভাযাত্রা! এর দর্শন পাওয়ার জন্য সহস্র নর-নারী, ধনী-দরিদ্র সেখানে জমায়েত হয়েছে। এবার বাবা ধীরে-ধীরে হাঁটতে শুরু করেন। চারিদিকের সম্পূর্ণ বায়ুমণ্ডল আনন্দে দুলছে। এই ভাবে শোভাযাত্রা 'চাওড়ী' পৌঁছয়। ভবিষ্যতে কেউ আর এই দৃশ্য দেখতে পাবে না। এখন তো শুধু সেটি মনে করে, চোখে সেই মনোরম অতীত কল্পনা করে, নিজের হৃদয়ের ব্যাকুলতা শান্ত করতে হবে। 'চাওড়ী' কে সুন্দর-সুন্দর কাঁচ এবং গ্যাস লণ্ঠন দিয়ে সাজানো হয়েছে। 'চাওড়ী'তে পৌঁছাতেই তাত্য়া পাটীল এগিয়ে গিয়ে বাবাকে আসন বিছিয়ে বালিশে ঠেসান দিয়ে বসিয়ে দিলেন। তারপর তাঁকে একটা ভালো চাপকান পরিয়ে, ভক্তরা নানা ভাবে তাঁর পূজো শুরু করে। বাবাকে সোনার মুকুট পরিয়ে, ফুল ও মণি-মুক্তার হার তাঁর গলায় পরায়। তারপর কপালে কুমকুমের বৈষ্ণবী তিলক এবং তারমধ্যে গোল টিপ লাগিয়ে, অনেকক্ষণ অপলক তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে। তাঁর মাথার কাপড়টা বদলে দেওয়া হয়। খানিকক্ষণ সেটা উপরেই ধরে রাখা হয় - সবার ভয়

যে, বাবা সেটা ফেলে না দেন। কিন্তু বাবা তো অন্তর্যামী। তিনি ভক্তদের প্রেম পরবশ হয়ে, তাদের এই সব কর্মকাণ্ড মাথা পেতে মেনে নিচ্ছিলেন। সেই সব আভূষণে সুসজ্জিত হওয়ার পর তো, বাবার শোভা অবর্ণনীয় হয়ে দাঁড়ায়।

নানাসাহেব নিমোনকর একটি বড়, সুন্দর ঝালোরযুক্ত ছাতা মাথার উপর ঘোরাচ্ছিলেন। বাপুসাহেব যোগ রূপোর এক সুন্দর থালাতে বাবার পাদপ্রক্ষালন করেন এবং অর্ঘ্য অর্পণ করার পর, রীতিসম্মতভাবে তাঁর পূজো-অর্চনা করেন। তাঁর হাতে চন্দন লাগিয়ে একটা পান দেন। তাত্য়া পাটীল ও অন্যান্য ভক্তরা তাঁর শ্রীচরণে লুটিয়ে পড়লেন। দুদিক দিয়ে ভক্তরা চামর ও পাখা দোলাচ্ছে। শামা ছিলিম তৈরী করে, তাত্য়া পাটীলকে দেন। উনি সেটি ভালো করে জ্বালিয়ে, বাবার কাছে দিলেন। বাবার ছিলিম টানা শেষ হলে সেটা ভগত্ ম্হালসাপতিকে এবং তারপর অন্যান্য ভক্তদের দেওয়া হয়। ধন্য সেই নির্জীব ছিলিম। কি মহান তার তপস্যা! কুমোরের চাকায় ঘুরে, রোদ্দুরে শুকিয়ে, তারপর আগুনে পুড়ে- কতই না কৃচ্ছ্রসাধনের পরীক্ষা তাকে দিতে হয়েছে। তবে গিয়ে সে বাবার কর স্পর্শ ও চুম্বনের সৌভাগ্য লাভ করে। এই সব হয়ে যাওয়ার পর, ভক্তরা বাবাকে ফুলের মালা দিয়ে বোঝাই করে ফুলের তোড়াও উপহার দেয়। বাবা তো বৈরাগ্যের পূর্ণ অবতার ছিলেন, সেই হীরে-পান্না ও ফুলের হার বা এই ধরনের সাজ-গোজে তাঁর কোন আকর্ষণ বা রুচি থাকতে পারে কি? কিন্তু ভক্তদের ভাব ও আন্তরিক প্রেমের টানে, তারা যাতে খুশি হয়, তিনি কোন আপত্তি করলেন না। সব শেষে মাঙ্গলিক সুরে বাদ্যযন্ত্র বাজতে শুরু হয় এবং বাপুসাহেব যোগ বাবার যথাবিধি আরতি করেন। আরতি শেষ হতেই, ভক্তরা বাবাকে প্রণাম করে একে-একে বিদায় নিল।

এবার তাত্য়া বাবাকে ছিলিম খাইয়ে, গোলাপজল, আতর ইত্যাদি লাগিয়ে একটা গোলাপ ফুল দিলেন। তিনি যখন বিদায় নিতে গেলেন, তখন বাবা আবদার করে বলেন- "তাত্য়া, আমার দেখা-শোনা ভালোভাবে করো। তুমি বাড়ী যেতে চাও, যাও। কিন্তু রাত্তিরে মাঝে-মধ্যে এসে আমায় একটু দেখে যেও।" তাত্য়া সে কথার আশ্বাস দিয়ে, বাড়ী ফিরে যান। তারপর বাবা অনেকগুলো চাদর বিছিয়ে নিজের বিছানা তৈরি করে, বিশ্রাম নিলেন।

এবার আমরাও এখানে বিশ্রাম নেব এবং এই অধ্যায়টি শেষ করে পাঠকদের কাছে একটি অনুরোধ জানাই- তাঁরা যেন প্রতিদিন শয্যা গ্রহণের পূর্বে সাইবাবা ও তাঁর 'চাওড়ী' শোভাযাত্রা স্মরণ করেন।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

অধ্যায় - ৩৮

বাবার হাঁড়ি, দেবমূর্তির উপেক্ষা, নৈবেদ্য বিতরণ, ঘোলের প্রসাদ।

গত অধ্যায়ে চাওড়ী শোভাযাত্রা বর্ণনা করা হয়েছিল। এবার এই অধ্যায়ে বাবার খাবার তৈরি করার হাঁড়ি ও অন্য কয়েকটি বিষয় বর্ণনা করা হবে।

প্রস্তাবনা ঃ-

হে সদগুরু সাই! তুমি ধন্য! তোমাকে আমরা প্রণাম করি। তুমিই সমগ্র বিশ্বকে সুখ দিয়েছ এবং ভক্তদের মঙ্গল করেছ। তোমার হৃদয় উদার। যে ভক্তরা তোমার অভয় চরণকমলে নিজেদের সমর্পিত করে দেয়, তুমি তাদের সর্বদা রক্ষা এবং উদ্ধার করো। ভক্তদের কল্যাণ ও পরিত্রাণ নিমিত্তেই, তোমার এই পৃথিবীতে অবতারণ হয়েছে। ব্রহ্মের ছাঁচে শুদ্ধ আত্মারূপী দ্রব্য ঢালা হলে তার থেকে যে মূর্তি বেরোয়, সেইটিই সন্তচূড়ামণি শ্রী সাইবাবা। তিনি স্বয়ং 'আত্মারাম", চির আনন্দধাম। এই জীবনের সমস্ত কার্য্যকলাপ নশ্বর জেনে, তিনি ভক্তদের নিষ্কাম ও মুক্ত করেছেন।

বাবার হাঁড়ি ঃ-

ধর্ম শাস্ত্রে যুগ অনুসারে ভিন্ন-ভিন্ন সাধনার উল্লেখ করা হয়েছে। **সত্যযুগে তপস্যা, ত্রেতাতে জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ এবং কলিযুগে দানের বিশেষ মাহাত্ম্য বলা হয়। সব রকমের দানের মধ্যে অন্নদান শ্রেষ্ঠ মানা হয়।** দুপুরবেলা খাবার

না পেয়ে আমরা সহজেই বিচলিত হয়ে উঠি। এমনিই অবস্থা অন্যান্য প্রাণীদেরও হয়। তাই কোন ভিক্ষুককে বা ক্ষুধার্তকে যে খাবার দেয়, সেই শ্রেষ্ঠ দানী। তৈত্তিরীয় উপনিষদে লেখা আছে- "অন্নই ব্রহ্ম এবং তার থেকেই সব প্রাণীদের উৎপত্তি। তার সাহায্যেই সবাই জীবিত থাকে এবং মৃত্যুর পর তাতেই লয় হয়।" কোন অতিথি দুপুরবেলা আমাদের বাড়ীতে আসলে, আমাদের এটাই কর্তব্য যে তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে খেতে অনুরোধ করি। অন্যান্য দান যেমন ধন, ভূমি, বস্ত্র ইত্যাদি দেওয়ার সময় পাত্রাপাত্র বিচার করতে হয়। কিন্তু অন্ন দানের ক্ষেত্রে, বিশেষ বিবেচনার প্রয়োজন হয় না। দুপুরবেলা যে আমাদের দরজায় এসে দাঁড়ায়, তাকে অবিলম্বে ভোজন করানো আমাদের পরম কর্তব্য। প্রথমে পঙ্গু, অন্ধ বা রুগ্ন ভিখিরিদের, তারপর শক্ত-সমর্থ লোকেদের এবং এদের সবার পরে, নিজের আত্মীয়-স্বজনদের পরিবেশন করাটাই উচিত। বাকী সবার চেয়ে, পঙ্গুদের খাওয়ানোর মাহাত্ম্য বেশী। অন্নদান ছাড়া অন্য সব প্রকারের দান তেমনি অসম্পূর্ণ যেমন চাঁদ ছাড়া তারা, কলশ ছাড়া মন্দির, পদ্ম ফুলহীন পুকুর, ভক্তিরহিত ভজন, সিঁদূরবিহীন সধবা, মধুরস্বরহীন গান, নুন ছাড়া খাবার। যেমন অন্যান্য খাদ্য পদার্থের মধ্যে ডাল সবচেয়ে ভালো, তেমনিই সমস্ত দানের মধ্যে অন্নদান শ্রেষ্ঠ। এবার দেখা যাক্, বাবা কি ভাবে খাবার তৈরী করে সেটা বিতরণ করাতেন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাবা অল্পাহারী ছিলেন। একটু-আধটু যা খেতেন, সেটা তিনি দু'একটা বাড়ী থেকে যা ভিক্ষে পেতেন, তাতেই পুরো হয়ে যেতো। কিন্তু যখন তাঁর সব ভক্তদের খাবার খাওয়াবার ইচ্ছে হত, তখন শুরু থেকে নিয়ে শেষ অবধি, সম্পূর্ণ ব্যবস্থা তিনি নিজেই করতেন। তিনি কারো উপর নির্ভর করতেন না,

আর কাউকে এ বিষয়ে কষ্টও দিতেন না। এমন কি পেষার কাজও তিনি নিজেই করতেন। প্রথমে নিজে বাজার গিয়ে সব জিনিষ যেমন ডাল, চাল, আটা, নুন লঙ্কা, জিরে, নারকেল এবং অন্যান্য মশলা নগদ দাম দিয়ে কিনে আনতেন। মস্‌জিদের খোলা উঠোনে উনুন (চুলা) বানিয়ে তাতে আগুন ধরাতেন। হাঁড়িতে ঠিক পরিমাণে জল ভরতেন। দুটো হাঁড়ি ছিল। একটা ছোট ও অন্যটা বড়। একটাতে একশো ও অন্যটাতে পাঁচশো লোকের খাবার তৈরী হত। কখনো তিনি মিষ্টি পোলাও বানাতেন ও কখনো মাংস মেশানো পোলাও (নোন্‌তা পোলাও)। কখনো-কখনো ডালও বানাতেন। শিলে মিহি করে মশলা পিষে হাঁড়িতে ঢালতেন। খাবার যাতে সুস্বাদু হয়, সে বিষয়ে তিনি যথেষ্ট খেয়াল রাখতেন। জোয়ারের আটার জলে অম্বল তৈরী করে, খাবারের সময় সব ভক্তদেরই পরিবেশন করতেন। খাবার ঠিক তৈরী হয়েছে কিনা, সেটা দেখবার জন্য নিজের কফ্‌নীর আস্তিন গুটিয়ে, নির্ভয়ে ফুটন্ত হাঁড়িতে হাত ঢুকিয়ে, খাবার নাড়াচাড়া করতেন। এতে তাঁর হাতে কোন পোড়ার দাগ বা ফোস্‌কা পড়ত না আর, মুখেও কোন ব্যথার চিহ্ন দেখা যেতো না। খাবার তৈরী হয়ে গেলে, মস্‌জিদ থেকে পাত্র আনিয়ে, মৌলবীকে 'ফাতিহা' পড়তে বলতেন। তারপর তিনি মহালসাপতি ও তাত্‌য়া পাটীলের প্রসাদের ভাগ আলাদা রেখে, বাকীটা গরীব ও অনাথ লোকেদের খাইয়ে তাদের তৃপ্ত করতেন। সত্যি ওরা ধন্য। বাবার তৈরী করা, সেই খাবার তাঁরই হাতে যাঁরা খেতে পেয়েছিলেন, তাঁরা সত্যিই ধন্য ও ভাগ্যবান। এবার অনেকে ভাবতে পারে যে, তিনি কি নিরামিষ এবং আমিষ খাদ্য পদার্থ প্রসাদ হিসেবে একই সঙ্গে বিতরণ করতেন? এর উত্তর একদম সরল ও সোজা। যারা আমিষ খেত, তাদের হাঁড়ি থেকেই প্রসাদ হিসেবে

দেওয়া হত এবং অন্যদের সেটা স্পর্শও করতে দিতেন না। তিনি কাউকে কখনো আমিষ খাবার খেতে উৎসাহিত করেননি এবং তাঁর কখনোই এই ইচ্ছে ছিল না যে, এটা কারো অভ্যাস হয়ে দাঁড়াক। এটা একটা খুব পুরনো নিয়ম যে, **যখন গুরুদেব প্রসাদ বিতরণ করেন তখন যদি শিষ্য সেটা গ্রহন করতে সন্দেহ বা দ্বিধা বোধ করে, তাহলে তাঁর অধঃপতন ঘটে।** এই নীতি ভক্তরা কতখানি গ্রহণ করতে পেরেছে, তা জানবার জন্য বাবা মাঝে-মাঝে ভক্তদের পরীক্ষা করতেন। একবার একাদশীর দিন তিনি দাদা কেলকরকে কিছু টাকা দিয়ে, মাংস কিনে আনতে বলেন। দাদা কেলকর ছিলেন প্রকৃত কর্মকাণ্ডী এবং প্রায় সব নিয়মগুলিই পালন করতেন। উনি জানতেন যে, দ্রব্য, অন্ন এবং বস্ত্র ইত্যাদি গুরুকে অর্পণ করাটাই পর্যাপ্ত নয়। তাঁর আদেশও শীঘ্র কার্য্যে পরিণত করলে পরেই তিনি প্রসন্ন হন। এটাই তাঁর দক্ষিণা। দাদা তক্ষুনি কাপড় পরে, একটা থলে নিয়ে বাজার যেতে উদ্যত হন। তখন বাবা ওঁকে ফেরত ডেকে বলেন- "তুমি যেও না, অন্য কাউকে পাঠিয়ে দাও।" তখন দাদা নিজের চাকর পাণ্ডুকে পাঠান। ওকে যেতে দেখে, বাবা ওকেও ফেরত ডেকে, এই কাজটা স্থগিত করে দেন।

আরেকবার তিনি দাদাকে বলেন- "দেখো তো নোনতা পোলাও-য়ের স্বাদটা ঠিক আছে কি না।" দাদা না দেখেই বলেন- "ভালো, ঠিক আছে।" তখন বাবা ওকে বলেন- "তুমি তো ভালো করে চোখ দিয়ে দেখলে না, জিভ দিয়ে একটু চাখলেও না। তাহলে কি করে বলছ যে, খুব ভালো হয়েছে? একটু ঢাকনাটা সরিয়ে দেখো।" বাবা দাদার হাত ধরে জোর করে পাত্রের মধ্যে ঢুকিয়ে বলেন- "নিজের গোঁড়ামি ছেড়ে একটু চেখে দেখো।" যখন মায়ের প্রকৃত প্রেম

সন্তানের উপর উপছে পড়ে, তখন মা তাকে চিমটিও কাটেন। কিন্তু তারপরই সন্তানের কান্না শুনে বুকে জড়িয়ে ধরেন। এই ভাবেই বাবা সাত্বিক মাতৃ-প্রেমের বশীভূত হয়েই, দাদার এইরূপ হাত ধরেন। কোন সন্ত বা গুরু নিজের কর্মকাণ্ডী শিষ্যকে বর্জিত ভোজনের জন্য আগ্রহ করে, নিজের অপকীর্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবেন না।

এইভাবে এই হাঁড়ির পরম্পরা **১৯১০** সাল পর্যন্ত চলে, এবং তারপর বন্ধ হয়ে যায়। একথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দাসগণু নিজের কীর্তনের মাধ্যমে, সমস্ত বম্বে প্রেসিডেন্সিতে বাবার কীর্তি দূরদূরান্তে প্রচার করেন। তাই এই প্রান্ত থেকে, লোকেদের দল শিরডী আসতে শুরু করে এবং কিছুদিনের মধ্যেই শিরডী পবিত্র তীর্থস্থলে পরিণত হয়। ভক্তরা নৈবেদ্য রূপে বাবার জন্য নানা রকমের সুস্বাদু ব্যঞ্জন আনত। সেগুলি এত বেশী মাত্রায় জড়ো হয়ে যেত যে, ফকিরদের ও ভিখিরীদের পেট ভরে খাওয়ানোর পরও বেঁচে যেত। নৈবেদ্য বিতরণের বিধি বর্ণনা করার আগে, আমরা নানাসাহেব চাঁদোরকরের ঐ কথাটি বর্ণনা করব যেটি স্থানীয় দেবী-দেবতাদের ও মূর্তির প্রতি বাবার সম্মানভাবনা বোঝাবে।

নানাসাহেব দ্বারা দেবমূর্তির উপেক্ষা ঃ-

কিছু লোক নিজেদের কল্পনা অনুসারে, বাবাকে ব্রাহ্মণ এবং কিছু তাঁকে মুসলমান বলে মানতো। কিন্তু আসলে তাঁর কোন জাতি ছিল না। কেউই নিশ্চিত রূপে এটা জানতে পারেনি যে তিনি কোন কুলে জন্মান এবং তাঁর মা-বাবা কে ছিলেন? তবে তাঁকে হিন্দু বা মুসলমান বলে কি করে ঘোষণা করা যেতে পারে? যদি তাঁকে মুসলমান বলা হয়, তাহলে মস্‌জিদে সব সময় 'ধুনি' এবং তুলসী বৃন্দাবন কেন

রাখতেন এবং শঙ্খ, ঘন্টা ও অন্য বাদ্যযন্ত্র কেনই বা বাজতে দিতেন? হিন্দুদের বিভিন্ন রকমের পূজো কেন স্বীকার করতেন? যদি সত্যি তিনি মুসলমান ছিলেন, তাহলে ওঁর কানে ফুটো কেন ছিল এবং হিন্দু মন্দিরগুলির জীর্ণতা সংস্কার কেন করিয়ে ছিলেন? তিনি হিন্দুদের মূর্তি পূজো বা দেবী-দেবতাদের এতটুকু উপেক্ষা কখনো সহ্য করেন নি।

একবার নানাসাহেব চাঁদোরকর, নিজের ভায়রা ভাই শ্রী বিণীওয়ালের সাথে, শিরডী আসেন। যখন তাঁরা মস্‌জিদে গিয়ে পৌঁছন, বাবা কথা বলতে বলতে হঠাৎ রেগে গিয়ে বলেন- "তুমি দীর্ঘকাল থেকে আমার সঙ্গে রয়েছো, তবে এই ধরনের ব্যবহার কেন করো?" নানাসাহেব প্রথমে এই কথার অর্থ বুঝতে পারেন না। অতএব বিনীতভাবে, তাঁর অপরাধ বুঝিয়ে দিতে অনুরোধ করেন। প্রত্যুত্তরে বাবা বললেন- "তুমি কখন কোপরগ্রাম এলে এবং তারপর ওখান থেকে কেমন করে শিরডী পৌঁছলে?" নানাসাহেব নিজের ভুল অবিলম্বে বুঝতে পারেন। ওঁর একটা নিয়ম ছিল যে, শিরডী আসার আগে উনি কোপরগ্রামে গোদাবরীর তীরে শ্রীদত্তাত্রেয়ের মন্দিরে পূজো করতেন। কিন্তু সেবার একটি বিশেষ কারণে, ঐ আত্মীয় দত্ত উপাসক হওয়া সত্ত্বেও, চাঁদোরকর ওঁকে হতোৎসাহিত করে, সোজা শিরডী এসে পৌঁছন। নিজের দোষ স্বীকার করে উনি বলেন- "গোদাবরীতে স্নান করার সময় পায়ে একটা বড় কাঁটা ফুঁটে যায়। খুব কষ্ট হচ্ছিল।" বাবা বললেন- "এটা তো তোমার ভুলের খুব ছোট্ট শাস্তি।" ভবিষ্যতে এই বিষয়ে সজাগ থাকতে, বাবা তাঁকে সাবধান করে দেন।

নৈবেদ্য বিতরণ ঃ-

এবার আমরা নৈবেদ্য বিতরণের দৃশ্য বর্ণনা করব। আরতি শেষ হওয়ার পর বাবার আশীর্বাদ ও উদী নিয়ে যখন ভক্তরা নিজের-নিজের বাড়ী চলে যেত, তখন বাবা পর্দা সরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে দেওয়ালের দিকে পিঠ করে খাবার খাওয়ার জন্য আসন গ্রহণ করতেন। ভক্তদের দুটো সারি ওঁর কাছে বসত। যারা নৈবেদ্য নিয়ে আসত, তারা নানা প্রকারের খাবার যেমন- লুচি, পেঁড়া, বর্ফী, ভাত ইত্যাদি থালায় সাজিয়ে ভিতরে পাঠিয়ে দিত। তারপর বাইরেই প্রতীক্ষা করত প্রসাদের জন্য। সমস্ত রকম খাবার একসঙ্গে মিশিয়ে, বাবার সামনে রাখা হত। বাবা সম্পূর্ণটা ভগবানকে উৎসর্গ করে, স্বয়ং গ্রহণ করতেন। তার থেকে খানিকটা, বাইরে অপেক্ষামান ভক্তদের দিয়ে, বাকীটা ভিতরের ভক্তদের পরিবেশন করা হতো। বাবা সবার মাঝে এসে বসলে, ভক্তরা প্রাণ ভরে খেত। ভিতরের সবাইকে রোজ এই প্রসাদ পরিবেশন করে খাওয়ানোর ভার, এবং তাদের ব্যক্তিগত সুখ সুবিধের দিকে নজর রাখার দায়িত্ব শামা ও নিমোনকরের উপর বাবা ন্যস্ত করেছিলেন। ওঁরা এই কাজটি বড় উৎসাহ ও যত্ন সহকারে সম্পন্ন করতেন। এই ভাবে পাওয়া প্রত্যেক গ্রাস ভক্তদের দিত, দৈহিক পুষ্টি ও মনের সন্তোষ। কত সুস্বাদু, পবিত্র ও প্রেমরসপূর্ণ ছিল সেই প্রসাদান্ন।

ঘোলের প্রসাদ ঃ-

এই সৎসঙ্গে বসে একবার যখন হেমাডপন্ত পেট ভরে খাবার খেয়ে নিয়েছেন, সেই সময় বাবা ওঁকে এক পেয়ালা ঘোল খেতে দেন। তার সাদা রঙ ওঁকে উৎফুল্ল করে, কিন্তু পেটে এতটুকু জায়গা

ছিল না। তাই কেবল এক চুমুক চেখে দেখলেন। ওঁর এই ধরনের উপেক্ষা দেখে বাবা বলেন- "সবটা খেয়ে নাও। এর পর এই সুযোগ আর পাবে না।" তখন উনি পুরো ঘোলটা খেয়ে নেন। হেমাডপন্ত বাবার সাংকেতিক নির্দেশের অর্থ শীঘ্রই বুঝতে পারেন! কারণ এই ঘটনার কিছুদিন পরই, বাবা সমাধিস্থ হন। পাঠকবৃন্দ! আমাদের হেমাডপন্তের প্রতি নিশ্চয় কৃতজ্ঞতা বোধ করা উচিত। তিনি এক পেয়ালা ঘোলই পান করেছিলেন। কিন্তু পরিবর্ত্তে, আমাদের জন্য রেখে গেছেন বাবার লীলামৃত- যা পেয়ালার পর পেয়ালা পান করেও শেষ হয় না।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

অধ্যায় - ৩৯

বাবার গীতা-শ্লোক ব্যাখ্যা, সমাধি মন্দির নির্মাণ।

এই অধ্যায়ে বাবা গীতার একটা শ্লোকের অর্থ বুঝিয়েছেন। কিছু লোকেদের ধারণা ছিল যে, বাবা সংস্কৃত ভাষা জানতেন না এবং নানাসাহেবও তাই ভাবতেন। হেমাডপন্ত মূল মারাঠী গ্রন্থের অধ্যায় **৫০** তে এই ধারণা ভুল প্রমাণিত করেছেন। অধ্যায় **৩৯** ও **৫০** এর বিষয়বস্তু একরকম হওয়ার দরুণ, এখানে সে দুটি সম্মিলিত ভাবে দেওয়া হচ্ছে।

প্রস্তাবনা ঃ-

শিরডীর সৌভাগ্যের বর্ণনা কে করতে পারে? দ্বারকামাঈও ধন্য যেখানে শ্রীসাই এসে থাকেন এবং সেখানেই দেহরক্ষা করেন।

শিরডীর স্ত্রী পুরুষও ধন্য, যাদের অনুগৃহীত করে সাই এতদূর তাদের গ্রামে এসে সেখানে বসবাস করেন। শিরডী আগে একটা ছোট্ট গ্রাম ছিল। কিন্তু শ্রী সাইয়ের সংস্পর্শে এসে, তার গুরুত্ব গেল বেড়ে এবং সেটি তীর্থস্থলে পরিণত হল।

শিরডীর মেয়েরাও পরম ভাগ্যবতী। বাবার প্রতি ওদের অসীম ও অচল ভক্তি-প্রেম প্রশংসার অতীত। সারাদিন ঘরে-বাইরের কাজকর্ম করতে-করতে, ওরা বাবার কীর্তির গুণগান করত। ওদের ভালবাসার উপমাই বা কি হতে পারে? কি মধুরই না ছিল সেই নামগান যা, গায়ক ও শ্রোতাদের মনে নিবিড় শান্তি এনে দিত।

বাবার দ্বারা টীকা ঃ-

কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে, বাবা সংস্কৃতও জানেন। একদিন নানাসাহেব চাঁদোরকরকে গীতার একটি শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিয়ে, তিনি লোকেদের হতভম্ব করে দেন। এর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ, শ্রী বি. ভি. দেব মারাঠী সাই লীলা পত্রিকা **৪** তে ছাপান। অন্যটি Sai Baba`s Charters and Sayings পুস্তকের **৬১** পৃষ্ঠে ও The Wonderous Saint Sai Baba পুস্তকের পৃষ্ঠা **৩৬** তে দেওয়া আছে। এই দুটি পুস্তকই শ্রী বি. ভি. নরসিংহ স্বামী দ্বারা রচিত। শ্রী বি. ভি. দেব ইংরাজী তারিখ **২৭-৯-১৯১৬** একটা বক্তব্য দেন যেটি, শ্রী নরসিংহ স্বামী দ্বারা রচিত পুস্তক 'ভক্তো কে অনুভব' (ভক্তদের অভিজ্ঞতা) এ ছাপা হয়। শ্রী দেব এই বিষয়ে প্রথম বিবরণ নানাসাহেব চাঁদোরকরের কাছে পান। তাই তাঁর কথা নীচে উদ্ধৃত করা হচ্ছে-

নানাসাহেব চাঁদোরকর বেদান্তের ভালো ছাত্র এবং পণ্ডিত ছিলেন। তিনি টীকা সহিত গীতার অধ্যয়ন করেন এবং তাঁর এ বিষয়ে খানিকটা অহংকারও ছিল। তাঁর ধারণা ছিল যে, বাবার সংস্কৃতের বা এ ধরনের শাস্ত্রের জ্ঞান নেই। বাবা তাঁর এই ভ্রম দূর করবেন বলে স্থির করেন। এ হচ্ছে সেই সময়কার কথা, যখন অল্পসংখ্যক ভক্তরা শিরডী আসত। নানাসাহেব এই সময় বাবার চরণ সেবা করছিলেন এবং অস্পষ্ট শব্দে কিছু গুন গুন করছিলেন।

বাবা -নানা, তুমি ধীরে-ধীরে কি বলছ?

নানা -আমি গীতার একটি শ্লোক পাঠ করছি।

বাবা -কোন্ শ্লোকটা?

নানা -ভগবদ্‌গীতার একটা শ্লোক।

বাবা -একটু জোরে বলো।

তখন নানা ভগবদ্‌গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের **৩৪** তম শ্লোক পড়তে শুরু করেন-

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।।

বাবা - তুমি এর অর্থ জানো?

নানা - আজ্ঞে হ্যাঁ, বাবা।

বাবা - তবে বলো তো।

নানা -এর অর্থ এই যে - তত্ত্বকে যাঁরা জানেন, সেই জ্ঞানী পুরুষদের প্রণাম করে তাঁদের সেবা করো ও নিষ্কপট ভাবে প্রশ্ন করে, সেই 'জ্ঞান' অর্জন করো। তখন সেই তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীগণ তোমাকে জ্ঞানের উপদেশ দেবেন।

বাবা -নানা, আমি এই ধরনের সংক্ষিপ্ত ভাবার্থ চাই না। আমায় প্রত্যেক শব্দের তার ভাষান্তরিত উচ্চারণের সঙ্গে ব্যাকরণসম্মত অর্থ বোঝাও।

এবার নানা এক-একটি শব্দের অর্থ বোঝাতে শুরু করেন।

বাবা - নানা, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করাটাই কি যথেষ্ট?

নানা - 'নমস্কার করা' ছাড়া আমি 'প্রণিপাত' শব্দের অন্য কোন অর্থ জানি না।

বাবা - 'পরিপ্রশ্ন' শব্দের অর্থ কী?

নানা - ঐ, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা।

বাবা -যদি 'পরিপ্রশ্ন' এবং 'প্রশ্ন'-র অর্থ একই, তাহলে ব্যাস 'পরি' উপসর্গ ব্যবহার করেন কেন? তাঁর কি মাথা খারাপ হয়েছিল?

নানা - আমি ত 'পরিপ্রশ্ন' শব্দের আর কোন অর্থ জানি না।

বাবা - সেবা? এখানে কোন ধরনের সেবার কথা ইঙ্গিত করা হচ্ছে?

নানা - এই- যে ধরনের সেবা আমরা আপনার করি।

বাবা - এই সেবা কি যথেষ্ট?

নানা - এ ছাড়া 'সেবা' শব্দের কোন বিশিষ্ট অর্থ আমার জানা নেই।

বাবা -পরের লাইনে 'উপদেক্ষন্তি তে জ্ঞানম্', জ্ঞানম্ শব্দের জায়গায় তুমি অন্য কোন শব্দ ব্যবহার করে অর্থ বলতে পারো।

নানা - আজ্ঞে হ্যাঁ।

বাবা - কি শব্দ?

নানা - অজ্ঞানম্।

বাবা -'জ্ঞানম্'-য়ের এর পরিবর্ত্তে 'অজ্ঞানম্' বসালে কি এই শ্লোকের কোন অর্থ বেরোয়?

নানা - আজ্ঞে না, শঙ্কর ভাষ্যে এই ধরনের কোন ব্যাখ্যা নেই।

বাবা -নেই তো কি হলো? যদি 'অজ্ঞানম্' শব্দটি ব্যবহার করে, অর্থ আরো পরিষ্কার হয় তাহলে তাতে আপত্তিটা কি?

নানা -'অজ্ঞানম্' শব্দটি বসিয়ে এর কি ভাবে অর্থ করা যায়, আমি বুঝতে পারছি না।

বাবা -কৃষ্ণ অর্জুনকে জ্ঞানী ও তত্ত্বদর্শীদের প্রণাম করে তাদের প্রশ্ন করতে ও সেবা করতে উপদেশ দেন কেন? কৃষ্ণ স্বয়ং কি তত্ত্বদর্শী নন? বস্তুতঃ স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ!

নানা -আজ্ঞে হ্যাঁ, তিনি জ্ঞানাবতার ছিলেন। কিন্তু আমিও বুঝতে পারছি না যে, কেন তিনি অর্জুনকে অন্য জ্ঞানীদের কাছে যেতে বললেন।

বাবা - তুমি কি সত্যি বুঝতে পারছ না?

এবার নানাসাহেব হতভম্ব হয়ে যান। ওঁর দর্প চূর্ণ হয়। তখন বাবা স্বয়ং এই ভাবে তার অর্থ বোঝাতে শুরু করেন -

১) জ্ঞানীদের শুধু সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেই চলে না। সদগুরুর প্রতি সম্পূর্ণ আত্ম সমর্পণ করতে হবে।

২) কেবল প্রশ্ন করাই যথেষ্ট নয়। কোন কু-প্রবৃত্তি বা বাক্য-জালে ফাঁসাবার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন করা বা গুরুর ভুল ধরার প্রবৃত্তি নিয়ে বা ভণ্ডামি করে প্রশ্ন করা উচিত নয়। বরং যথোচিত মর্যাদা সহকারে, কেবল মোক্ষ বা আধ্যাত্মিক পথে উন্নতি লাভ করার উদ্দেশ্যেই প্রশ্ন করা উচিত।

৩) "আমি সেবা করার বা না করার বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র - করতেও পারি আর নাও করতে পারি"- যে এই ধরনের মনোভাব নিয়ে সেবা করে, তার সেবাকে সেবা বলা যায় না। তার বোঝা উচিত যে, নিজের দেহের উপর তার কোন অধিকার নেই। এই শরীরের উপর গুরুরই অধিকার এবং শুধু তাঁর কথামত চলে, তাঁরই সেবার নিমিত্তেই সেটি বিদ্যমান রয়েছে। এইরূপ আচরণে সদগুরু

তোমায় সেই 'জ্ঞান' (যার কথা ঐ শ্লোকে বলা হয়েছে) কি বস্তু তা দেখিয়ে দেবেন।

নানা বুঝতে পারেন না যে, গুরু কিভাবে অজ্ঞানের শিক্ষা দেন।

বাবা - জ্ঞানের উপদেশ কাকে বলে? অর্থাৎ ভবিষ্যতে যে আত্মানুভূতি লাভ হবে তার শিক্ষা। অজ্ঞানের নাশ হওয়াই জ্ঞান।

(গীতার শ্লোক **১৮-৬৬** তেই জ্ঞানেশ্বরী ভাষ্যে এই ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে - "হে অর্জুন, তোমার ঘুম ও স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলে তুমি নিজ স্বরূপ হও।" এই রকমই গীতার **৫-১৬** অধ্যায়ের টীকাতে লেখা আছে - জ্ঞানের তাৎপর্য্য, অজ্ঞান দূর করা ছাড়া, আর কিছু হতে পারে কি?

অন্ধকার নষ্ট হওয়ার অর্থই প্রকাশ। দ্বৈত ভাব দূর করার আলোচনার মানে হল, অদ্বৈতের কথা বলা। যখন অন্ধকার দূর করার কথা বলা হয়, তখন তার অর্থ হচ্ছে যে আমরা আলোর কথা বলছি। অদ্বৈতের অবস্থা উপলব্ধি করতে গেলে, সর্বাগ্রে দ্বৈতের ভাব দূর করতে হবে। এটাই অদ্বৈত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার লক্ষণ। দ্বৈত অবস্থায় থেকে অদ্বৈতের আলোচনা কে করতে পারে? যতক্ষণ সেরকম অবস্থা প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ কি কেউ সেটা অনুভব করতে পারে? শিষ্য সদগুরুর মতই জ্ঞান-মূর্তি। তাঁদের দুজনের মধ্যে শুধু অবস্থা, উচ্চ অনুভূতি, অদ্ভুত অলৌকিক সত্য, অদ্বিতীয় যোগ্যতা এবং ঐশ্বর্য্যের ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকে। সদগুরু নির্গুন নিরাকার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। আসলে তিনি বিশ্ব ও মানব কল্যাণ হেতুই, স্বেচ্ছায় মানব শরীর ধারণ করেন। কিন্তু নরদেহ ধারণ করা সত্ত্বেও, তাঁর অস্তিত্ব সীমাহীন। তাঁর আত্মোপলব্ধি, দৈবিক শক্তি ও জ্ঞান সর্বদা এক রকমই থাকে।

আসলে শিষ্যেরও ঐ একই স্বরূপ। কিন্তু অসংখ্য জন্মের সংস্কারের ফলে, অবিদ্যার আবরণ তাকে ঢেকে রাখে। তাই ওর ভ্রম হয় এবং নিজের শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ বিস্মৃত হয়। গীতার অধ্যায় ৫এ দেখো - "অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্ত জন্তবঃ।" ওর এটা একটা ভ্রম মাত্র- "আমি জীব, একটি প্রাণী, দূর্বল ও অসহায়।" এই অজ্ঞানরূপী জড়কে কেটে ফেলার জন্য গুরুকে উপদেশ দিতে হয়। এই ধরনের শিষ্যকে যে জন্ম জন্মান্তর থেকে এই ধারনা করে বসে আছে যে, "আমি ত জীব, দুর্বল এবং অসহায়", গুরু সহস্র জন্ম ধরে শিখিয়ে যাচ্ছেন- "তুমিই ঈশ্বর, সর্বশক্তিমান এবং সর্বসমর্থ।" তবে গিয়ে তার কিঞ্চিৎমাত্র আভাস হয় যে- "যথার্থে আমি ঈশ্বর।" সর্বদা মোহগ্রস্থ হয়ে থাকার দরুণ, ওর এইরূপ মনে হয়- "আমি শরীর, একটি জীব এবং ঈশ্বর ও এই বিশ্ব আমার থেকে ভিন্ন বস্তু।" কর্মানুসারে প্রত্যেক প্রাণী সুখ-দুঃখ ভোগ করে। এই মোহ, এই ভ্রান্তি এবং এই অজ্ঞতার জড় নষ্ট করার জন্য আমাদের নিজেকে প্রশ্ন করা উচিত যে এই অজ্ঞতা কোথায় এবং কি করে জন্মাল? শিষ্যের এই অনুসন্ধানের দিগ্‌দর্শন করানোকেই, উপদেশ বলা হয়।

অজ্ঞানের উদাহরণ ঃ-

১) আমি একটি জীব।

২) শরীরই আত্মা। (আমি আত্মা)

৩) ঈশ্বর, বিশ্ব এবং জীব পৃথক তত্ত্ব।

৪) আমি ঈশ্বর নই।

৫) শরীর আত্মা নয়- এর বোধ না হওয়া।

৬) এর জ্ঞান না থাকা যে, ঈশ্বর, বিশ্ব এবং জীব এক ও অভিন্ন।

যতক্ষন শিষ্যের সামনে এই ভুলগুলি তুলে না ধরা হয়, ততক্ষন সে এটা অনুভবই করতে পারে না যে ঈশ্বর, জীব এবং শরীর কি; তাদের মধ্যে পারস্পরিক কি সম্বন্ধ এবং ওরা ভিন্ন না অভিন্ন? এই ধরনের শিক্ষা দেওয়া ও ভ্রম দূর করাকেই, 'অজ্ঞান' এর জ্ঞানোপদেশ বলা হয়। এবার প্রশ্ন এই যে- "জীব- যে নিজেই জ্ঞান-মূর্তি, তার জ্ঞানের কি দরকার?" উপদেশের তাৎপর্য্য তো শুধু ত্রুটিগুলি তার সামনে তুলে ধরে তার অজ্ঞান দূর করা। বাবা এও বলেন -

১) 'প্রণিপাত' এর অর্থ 'শরণাগতি'।

২) দেহ, মন ও অর্থ - সব কিছু সমর্পণ করা উচিত।

৩) কৃষ্ণ অন্য জ্ঞানীদের দিকে কেন সংকেত করেন? সদ্‌ভক্তের জন্য তো প্রত্যেক তত্ত্বই বাসুদেব (ভগবৎ গীতা অধ্যায় ৭-১৯। অর্থাৎ যে কোন গুরুই শিষ্যর জন্য কৃষ্ণ)। গুরুও শিষ্যকে বাসুদেব বলে মনে করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ এঁদের দুজনকে নিজের প্রাণ ও আত্মা। শ্রীকৃষ্ণ জানতেন যে এমন অনেক ভক্ত ও গুরু বিদ্যমান আছেন। তাই তাদের মাহাত্ম্য বাড়াবার জন্যই, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই কথা বলেন।

সমাধি মন্দিরের নির্মাণ ঃ-

বাবা যা করতে চাইতেন সে বিষয়ে আলোচনা বা হৈ-চৈ করতেন না। পারিপার্শিক অবস্থা এমন করে দিতেন যে, লোকেদের তার মন্থর অথচ নিশ্চিত পরিণাম দেখে বড়ই আশ্চর্য্য লাগত। সমাধি মন্দির এই কথারই উদাহরণ। নাগপুরের প্রসিদ্ধ লক্ষপতি শ্রীমান বাপুসাহেব

বুটী সপরিবারে শিরডীতে থাকতেন। একবার ওঁর মনে হয় যে, শিরডীতে ওঁর নিজস্ব একটা বাসস্থান (বাড়ী) থাকা উচিত। কিছু দিন পর দীক্ষিত 'ওয়াড়া'য় ঘুমিয়ে থাকার সময়, তিনি একটা স্বপ্ন দেখেন- বাবা বলছেন- "তুমি নিজের একটা 'ওয়াড়া' ও একটা মন্দির তৈরী করাও।" শামাও সেখানে, শুয়েছিলেন এবং উনিও ঠিক এই একই স্বপ্ন দেখেন। বাপুসাহেব ঘুম থেকে ওঠে দেখেন শামা কাঁদছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় শামা বলেন- "এক্ষুনি আমি একটা স্বপ্ন দেখলাম যে, বাবা একেবারে আমার কাছে এসে স্পষ্ট শব্দে বললেন যে, মন্দিরের সাথে 'ওয়াড়া' বানাও। আমি সব ভক্তদের ইচ্ছে পূরণ করব। বাবার মধুর ও প্রেমপূর্ণ শব্দ শুনে আমারও প্রেম উপছে পড়ে এবং গলা রুদ্ধ হয়ে চোখ থেকে প্রেমাশ্রু বইতে লাগল।" তাই আমি জোরে-জোরে কাঁদছিলাম। বাপুসাহেব বুটী খুবই অবাক হন যে, দুজনেরই স্বপ্ন এক রকম কি করে হতে পারে? অর্থশালী তো তিনি ছিলেনই। তাই একটা 'ওয়াড়া' নির্মাণ করাবেন স্থির করেন। শামার সাথে বসে একটা নক্সা আঁকেন। কাকাসাহেব দীক্ষিতও সেটা অনুমোদন করেন। এবার সেই নক্সা বাবার সামনে রাখা হয়। তিনিও তত্ক্ষণাৎ স্বীকৃতি দিয়ে দেন। তখন নির্মাণকার্য্য শুরু করে দেওয়া হয় এবং শামার তত্ত্বাবধানে প্রথম তলা, মাটির নীচের ঘর ও কুয়ো তৈরী হয়ে যায়। বাবা লেন্ডীবাগ যেতে আসতে কখনো-কখনো কিছু পরামর্শ দিতেন। এরপর এই কাজটি বাপুসাহেব যোগকে দেওয়া হয়। যখন এই ভাবে কাজ এগোচ্ছিল, সেই সময় একদিন বাপুসাহেবের খেয়াল হয় যে একটু খোলা জায়গাও অবশ্যই রাখা উচিত এবং তার ঠিক মাঝখানে শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি স্থাপনা করলে ভালো হয়। তিনি নিজের এই প্রস্তাবটি শামাকে জানান এবং বাবার কাছে অনুমতি নিতে অনুরোধ করেন। বাবা সে সময় 'ওয়াড়া'র পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

তখন শামা তাঁর কাছে এ বিষয়ে অনুমতি চান। শামার কথা শুনে বাবা স্বীকৃতি দিয়ে বলেন- "যখন মন্দিরের কাজ পুরো হয়ে যাবে, তখন আমি স্বয়ং সেখানে থাকব।" ওয়াড়ার দিকে তাকিয়ে বলেন, "ওয়াড়া তৈরী হয়ে গেলে, আমরা সবাই সেটা উপভোগ করব। ওখানেই থাকব, ঘুরব-ফিরব এবং পরস্পরকে বুকে জড়িয়ে আনন্দ সহকারে দিন কাটাব।" তখন শামা জিজ্ঞাসা করেন- "এই মুহূর্তটি মূর্তিকক্ষের ভিত্তি স্থাপন করার জন্য কি শুভ?" বাবা স্বীকৃতিসূচক উত্তর দেওয়ায়, শামা একটা নারকেল এনে ভাঙ্গেন এবং কাজ শুরু করে দেওয়া হয়। ঠিক সময় সব কাজ পুরো হয়ে যায় এবং শ্রীকৃষ্ণের একটা সুন্দর মূর্তি তৈরী করাবার ব্যবস্থা করা হয়। তখনও মূর্তির কাজ শুরুও হয়নি, একটা নতুন ঘটনা সবাইকে ব্যস্ত করে তোলে। বাবার স্বাস্থ্য চিন্তাজনক হয়ে দাঁড়ায় এবং মনে হল বাবা দেহরক্ষা করবেন। বাপুসাহেব খুবই হতাশ ও উদাস হয়ে পড়লেন। তিনি ভাবেন- "বাবা চলে গেলে 'ওয়াড়া' তাঁর পবিত্র চরণের স্পর্শ হতে বঞ্চিত থেকে যাবে এবং আমার সব অর্থব্যয় (প্রায় এক লক্ষ টাকা) ব্যর্থ হয়ে যাবে।" কিন্তু শেষ সময় বাবার ইচ্ছে ("আমায় ওয়াড়াতেই রেখো") শুধু বুটী সাহেবকেই নয় বরং প্রতিটি মানুষকে সান্ত্বনা ও শান্তি প্রদান করে। বাবার পবিত্র শরীর শ্রীকৃষ্ণের মূর্তির জায়গায় স্থাপিত হলো। বাবা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হলেন এবং 'ওয়াড়া' সাইবাবার সমাধি মন্দির।

তাঁর অনন্ত লীলার কোন সীমা কেউ পায়নি। শ্রী বাপুসাহেব বুটী ধন্য, যাঁর 'ওয়াড়া'-য় বাবার দিব্য এবং পবিত্র পার্থিব শরীর বিশ্রাম করছে।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

অধ্যায় - ৪০

শ্রী সাইবাবার কাহিনী

১) শ্রী বি. ভি. দেবের মায়ের 'উদ্‌যাপন' অনুষ্ঠানে যোগদান এবং ২) হেমাড পন্তের গৃহে চিত্ররূপে আগমন।

এই অধ্যায়ে দুটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে - ১) বাবা কিভাবে শ্রীমান দেবের মায়ের বাড়ীতে 'উদ্‌যাপন' অনুষ্ঠানে এবং ২) বান্দ্রাতে হেমাডপন্তের বাড়ীতে দোলের দিন মধ্যাহ্ন ভোজে যোগ দিয়েছিলেন।

প্রস্তাবনা ঃ-

শ্রীসাই সমর্থ ধন্য, যাঁর নাম বড় সুন্দর! তিনি সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক, দুই বিষয়েই নিজের ভক্তদের উপদেশ দেন এবং ভক্তদের নিজের জীবনের লক্ষ্য প্রাপ্ত করতে সাহায্য করে, ওদের নিজের শক্তি প্রদান করেন। তিনি ভেদ-বুদ্ধি নষ্ট করে, তাদের অপ্রাপ্য বস্তুরও প্রাপ্তি করান। ভক্তরা সাইয়ের চরণে ভক্তিসহ নত হয় এবং শ্রী সাইবাবাও অভেদ জ্ঞানে প্রেম পূর্বক ভক্তদের বুকে জড়িয়ে ধরেন। তিনি ভক্তদের সঙ্গে এমন ভাবে একাত্ম হয়ে যান যেমন, বর্ষা ঋতুতে জল নদীর সাথে মিশে, তাকে শক্তি ও মান দেয়।

শ্রীমতি দেবের উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান ঃ-

শ্রী বি. ভি. দেব ডহানুতে (জেলা - ঠানে) মাম্‌লৎদার ছিলেন। ওঁর মা প্রায় পঁচিশ-তিরিশটা বিভিন্ন সংকল্প পালন করেছিলেন। একটি

উদ্‌যাপন প্রয়োজন। উদ্‌যাপনের সাথেই প্রায় একশো-দু'শোজন ব্রাহ্মণভোজরেও আয়োজন করা হয়েছিল। শ্রী দেব একটি দিন ঠিক করে বাপুসাহেব যোগকে একটা চিঠি লেখেন- "তুমি আমার হয়ে শ্রীসাই বাবাকে উদ্‌যাপন ও ভোজে আসার জন্য অনুরোধ কোর এবং তাঁকে জানিও যে তাঁর অনুপস্থিতিতে উৎসব অসম্পূর্ণই রয়ে যাবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তিনি অবশ্যই ডহানু এসে দাসকে কৃতার্থ করবেন।"

বাপুসাহেব যোগ বাবাকে সেই চিঠিটি পড়ে শোনান। বাবা চিঠিটা মন দিয়ে শোনেন, এক শুদ্ধ চিত্তের সরল আমন্ত্রণ লক্ষ্য করে তিনি বলেন-**"যে আমায় স্মরণ করে, তার কথা আমার সর্বদা মনে থাকে। কোথাও যাওয়ার জন্য আমার কোন গাড়ী, টাঙ্গা বা বিমানের দরকার হয় না। যে আমায় ভালোবেসে ডাকে, তার সামনে আমি অবিলম্বে উপস্থিত হই।** ওকে চিঠি মারফৎ জানিয়ে দাও যে, আমি আরো দুটি ব্যক্তিকে নিয়ে অবশ্যই যাব।" শ্রী যোগ সে কথা শ্রীদেবকে লিখে পাঠিয়ে দেন। চিঠি পড়ে দেব খুব খুশী হন; কিন্তু উনি এও জানতেন যে, বাবা শুধু রাহাতা, রুই এবং নিমগ্রাম ছাড়া আর কোথাও যাওয়া-আসা করেন না। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়- "বাবার পক্ষে কিই বা অসম্ভব? তিনি তো অসংখ্য চমৎকার দেখিয়েছেন। তিনি সর্বব্যাপী- যে কোন বেশেই অনায়াসেই আবির্ভূত হয়ে, নিজের প্রতিজ্ঞা পালন করতে পারেন।"

উদ্‌যাপনের কিছু দিন আগে, এক সন্ন্যাসী ডহানু স্টেশনে নামে। তার বেশভূষা বাঙ্গালী সন্ন্যাসীর মত ছিল এবং দূর থেকে দেখে মনে

হচ্ছিল, যেন কোন গোরক্ষা সংস্থানের স্বেচ্ছাসেবক। সে সোজা স্টেশন মাস্টারের কাছে গিয়ে, চাঁদার জন্য নিবেদন করে। তিনি ওকে বলেন- "তুমি এখানকার মাম্‌লৎদার শ্রীদেবের কাছে যাও এবং ওঁর সাহায্যে তুমি যথেষ্ট চাঁদা পেতে পারবে।" ঠিক সেই সময় মাম্‌লৎদারও সেখানে এসে পৌঁছান। তখন স্টেশন মাস্টার সন্ন্যাসীর সাথে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন এবং দুজনে প্ল্যাটফর্মে বসেই কথাবার্তা বলতে লাগলেন। মাম্‌লৎদার বলেন- "এখানকার প্রধান নাগরিক শ্রী রাওসাহেব নরোত্তম শেঠ, ধার্মিক কার্য্যের জন্য একটা ফর্দ তৈরী করেছেন। অতএব এখন আরেকটা ফর্দ তৈরি করা, একটু অনুচিত মনে হচ্ছে। তাই ভালো হয়, যদি আপনি দু-চার মাস পর এখানে আসেন।" এই কথা শুনে সন্ন্যাসী সেখান থেকে চলে যায় এবং এক মাস পর শ্রীদেবের বাড়ীর সামনে তাকে টাঙ্গা থেকে নামতে দেখা যায়। ওকে দেখে শ্রীদেব মনে-মনে ভাবেন- "নিশ্চয় চাঁদা চাইতে এসেছে।" উনি শ্রী দেবকে ব্যস্ত দেখে বলেন- "শ্রীমান! আমি চাঁদা নিতে আসিনি। খাবার খেতে এসেছি।" শ্রীদেব উত্তর দিলেন- "খুব আনন্দের কথা। বসুন, এ তো আপনারই বাড়ী।"

সন্ন্যাসী - আমার সাথে আরও দুটি ছেলে আছে।

দেব - দয়া করে ওদেরও নিয়ে আসুন।

খাবার পরিবেশন হতে তখনো দু-ঘন্টা সময় ছিল। তাই শ্রীদেব জিজ্ঞাসা করেন- "যদি বলেন তো, আমি কাউকে ওদের ডাকতে পাঠিয়ে দিই।"

সন্ন্যাসী - আপনি চিন্তা করবেন না, আমরা ঠিক সময় পৌঁছে যাব।

দেব ওকে দুপুরে আসতে অনুরোধ করেন। ঠিক বারোটার সময় তিন জন ওখানে এসে পৌঁছায় এবং ভোজে সম্মিলিত হয়ে, খাবার খেয়ে সেখান থেকে চলে যায়।

উৎসব শেষ হয়ে যাওয়ার পর, শ্রীদেব শ্রীযোগকে বাবার 'প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ'র বিষয় নালিশ করে চিঠি লেখেন। শ্রীযোগ সেই চিঠিটা নিয়ে বাবার কাছে যান। কিন্তু চিঠি পড়ার আগেই, বাবা ওঁকে বলেন- "আরে, আমি ওকে যা কথা দিয়েছিলাম, সে কথার খেলাপ করিনি। ওঁকে জানিয়ে দাও যে, আরো দুজনকে সঙ্গে নিয়ে ওর ভোজে ঠিকই উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু ও আমায় চিনতেই পারেনি। তাহলে নেমন্তন্ন করার কষ্ট কেন করল? ওঁকে লেখো যে, ও বোধহয় ভেবেছিল সেই সন্ন্যাসী চাঁদা চাইতে এসেছে। কিন্তু আমি কি ওর সন্দেহ দূর করে দিইনি? আমি কি বলিনি আরো দুজনকে নিয়ে আসব? আর সেই ত্রিমূর্তি কি ঠিক সময় ভোজে সম্মিলিত হয়নি? দেখো, **আমি নিজের কথা রাখার জন্য নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দেব। আমার কথার কখনো খেলাপ হয় না।"**

এই উত্তর শুনে যোগের মনে খুব আনন্দ হয় এবং উনি পুরো ব্যাপারটা লিখে শ্রীদেবকে পাঠিয়ে দেন। চিঠিটা পড়তে পড়তে শ্রীদেবের চোখ থেকে ঝর ঝর করে জল পড়তে থাকে। ওঁর নিজের উপর খুব রাগ হচ্ছিল। মিছিমিছি বাবার উপর দোষারোপ করলেন। অবাক হয়ে ভাবছিলেন যে, সন্ন্যাসীর প্রথম বারের আগমন তাকে কি ভাবে বিভ্রান্ত করল। "আরো দুজনকে সঙ্গে নিয়ে ভোজে আসব," সন্ন্যাসীর এই কথার প্রকৃত অর্থও তিনি ধরতে পারলেন না!

এই ঘটনাটি আমাদের শুধু এটাই বোঝায় যে, **যখন ভক্ত**

অনন্য ভাবে সদগুরুর শরণে যায়, তখন সে অনুভব করতে শুরু করে যে, গুরু কৃপায় তার সমস্ত ধার্মিক অনুষ্ঠান সুচারুভাবে এবং নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়।

হেমাডপন্তের দোলের ভোজ ঃ-

এবার আমরা একটা অন্য ঘটনা নিই যাতে বলা হয়েছে যে, বাবা কিভাবে ছবির মাধ্যমে উপস্থিত হয়ে নিজের ভক্তদের ইচ্ছে পূরণ করেন। **১৯১৭ সালে দোল পূর্ণিমার দিন হেমাডপন্ত একটা স্বপ্ন দেখেন যে, বাবা ওঁকে জাগিয়ে বলছেন- "আমি আজ তোমার বাড়ীতে খেতে আসব।"**

জাগানোটা স্বপ্নেরই একটা অংশ ছিল। কিন্তু যখন ওঁর সত্যি-সত্যি ঘুম ভাঙ্গে, তখন উনি বাবাকে বা অন্য কোন সন্ন্যাসীকে দেখতে পান না। একটু সজাগ হয়ে ভাবতেই, সন্ন্যাসীর প্রত্যেকটি কথা ওনার মনে পড়ে যায়। যদিও উনি বাবার সঙ্গে গত সাত বছর ধরে থাকছিলেন, এবং নিরন্তর তাঁরই ধ্যান করতেন, তবুও এটা কখনোই আশা করেননি যে, বাবা ওঁর বাড়ীতে এসে খাবার খেয়ে ওঁকে কৃতার্থ করবেন। বাবার কথা স্মরণ করে অত্যন্ত খুশী হয়ে উনি নিজের স্ত্রীকে বলেন- "আজ দোলের দিন। এক সন্ন্যাসী অতিথি খেতে আসবেন। তাই খাবার একটু বেশী করে তৈরী কোর। ওঁর স্ত্রী অতিথির বিষয় জিজ্ঞাসাবাদ করায়, হেমাডপন্ত কোন কথা না লুকিয়ে, স্বপ্নের বৃত্তান্ত খুলে বলেন। তখন ওঁর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করেন যে- "তিনি কি শিরডীর অত ভালো খাবার ছেড়ে, এতদূর বান্দ্রাতে আমাদের সাদা-মাটা খাবার খেতে আসবেন?" হেমাডপন্ত নিজের দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ

করে বলেন- "বাবার জন্য অসম্ভবই বা কি? হতে পারে তিনি স্বরূপে না এসে, অন্য কোন রূপ ধারণ করে আসবেন!" এরপর খাবার তৈরীর সব রকম ব্যবস্থা শুরু হয়। দোল পূজো শুরু হলে, শালপাতা বিছিয়ে তার চারিদিকে আল্পনা দেওয়া হয়। দুটি সারি ও তার মাঝখানে রইল অতিথির জন্য স্থান। বাড়ীর সব লোকেরা যথা পুত্র, নাতি, মেয়ে-জামাই নিজের-নিজের স্থান গ্রহণ করে এবং পরিবেশন শুরু হয়। প্রত্যেকে উৎসুক হয়ে, সেই অজ্ঞাত অতিথির জন্য অপেক্ষা করছিল। বারোটা বেজে গেল, কেউ এসে পৌঁছল না। এবার দরজা বন্ধ করে অন্নশুদ্ধির জন্য ঘি বিতরণ করে অগ্নিদেবকে আহুতি দিয়ে, শ্রী কৃষ্ণকে নৈবেদ্য অর্পণ করা হল। সবাই খাবার খেতে শুরু করবে, এমন সময় সিঁড়িতে কারো পায়ের আওয়াজ স্পষ্ট শোনা যায়। হেমাডপন্ত তাড়াতাড়ি উঠে দরজাটা খোলেন। দরজায় দাঁড়িয়ে দুটি লোক ১) আলী মুহম্মদ ২) মৌলানা ইস্মু মুজাওয়ার। সবাই খাবার-খেতে বসেছে দেখে, এঁরা দুজনে মাপ চেয়ে বলেন- "আপনাদের বড় অসুবিধেয় ফেললাম। তার জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। আপনি থালা ছেড়ে উঠে এসেছেন এবং সবাই আপনার জন্যই প্রতীক্ষা করছেন। তাই আপনি দয়া করে আপনার এই সম্পদ সামলান। এর সম্বন্ধে আশ্চর্য্যজনক ঘটনা অন্য কোন সময় বলব।" এই বলে ওঁরা একটা পুরনো খবরের কাগজে মোড়া প্যাকেট বার করে, সেটা খুলে সামনের টেবিলে রাখেন। কাগজের আবরণ সরাতেই, বাবার একটা বড়, সুন্দর ছবি দেখে হেমাডপন্ত নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। উনি মনে মনে ভাবেন- "বাবা এই ছবির মাধ্যমেই আমাকে আশীর্বাদ করেছেন।" উনি আলী মুহম্মদকে প্রশ্ন করেন- "বাবার এই সুন্দর ছবিটি আপনি কোথায় পেলেন?" আলী মুহম্মদ তখন জানান- "আমি এইটি একটা

দোকান থেকে কিনেছিলাম। এর বিষয় বাকী কথা পরে জানাব। আপনি দয়া করে এবার খেতে বসুন, সবাই আপনার জন্যই অপেক্ষা করছে।" হেমাডপন্ত ওঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে নমস্কার করেন। এরপর মাঝখানে পাতা আসনটির ওপর ছবিটি রেখে, বিধিপূর্বক নৈবেদ্য অর্পণ করেন। সবাই ঠিক সময়ে খেতে শুরু করে। ছবিটিতে বাবার সুন্দর মনোহর রূপ দেখে, সবাই পরম প্রীত হয়ে ভাবতে বাধ্য হয় যে, এই আশ্চর্য ঘটনা কি ভাবে ঘটল? বাবা এই ভাবে হেমাডপন্তকে স্বপ্নে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালন করলেন।

এই ছবির বিষয়ে বিবরণ অর্থাৎ আলী মুহম্মদ ছবিটি কি করে পান এবং কেনই বা সেটা হেমাডপন্তকে উপহার দেন, এই বিষয়ে বর্ণনা পরের অধ্যায়ে করা হবে।

।। श्री साईनाथार्पनमस्तु। शुभम् भवतु।।